শিখরবাসিনী।

উপন্যাস।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

৮ নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

পনা।   ৮

কলিকাতা,

সিমুলিয়া, বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬৮ সংখ্যক ভবনে কৃপানন্দ যন্ত্রে
শ্রীনফরচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী, উদারচেতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ, বি,এল্।

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আপনি বিদ্বান্, এবং বিদ্যার যথেষ্ট গৌরব ও সম্মান করিয়া থাকেন। এই ভবসংসারে, আপনার অকৃত্রিম স্নেহ, আপনার অমায়িক ভালবাসা, আমার জীবনের শান্তিস্বরূপ হইয়াছে। বাল্যকালে, আপনার পবিত্র স্নেহে, আমি লালিত, পালিত, চিরস্নিগ্ধ ও প্রফুল্লিত হইয়াছি। এই সংসার স্বরূপ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে আপনার ন্যায় ঋষিতুল্য, অমায়িক লোক অতি বিরল; এ জন্য আমার এই চারুশীলা শিখরবাসিনীকে উপহার স্বরূপ আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আমার "শিখরবাসিনী", অলঙ্কৃতা হইলেও, আপনি যে ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছোট-জাগুলিয়া,
১লা কার্ত্তিক, ১২৯৭।

চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শিখরবাসিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজন কুটীর।

অদ্য ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শূন্য নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অদ্য পূর্ণিমা কি অমাবস্যা কিছুই নিরাকরণ করা যায় না। আকাশ ঘোর জলদ-জালে আচ্ছন্ন। জগৎ এমন ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, নিকটস্থ বৃক্ষরাজী পর্যন্তও লক্ষিত হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একবার ভয়ানক মেঘগর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই ভয়ানক মেঘগর্জ্জন এক একবার যেন নিস্তব্ধ জগৎকে প্রকম্পিত করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুল্লতা চমকিত হইতেছে। বিদ্যুতের সেই ক্ষণপ্রভ আলোক যেন সেই ঘোরান্ধকার রজনীকেও মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত করিতেছে। বায়ু অতি ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। অচিরেই যে ভয়ানক জল ও ঝড় উপস্থিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ভীষণ সময়ে একটি বিংশতি বর্ষীয় যুবক গঙ্গা নদীতীরে একখানি নৌকার উপর বসিয়া চিন্তিত অন্তঃকরণে আকাশের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? একমনে নিবিষ্টচিত্তে কি ধ্যান করিতেছেন? তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম লক্ষিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস শ্রুতিগোচর হইতেছে। যুবক কি নিবিষ্ট

... ...গুলস্থ মেঘমালার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন? না, স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ভাব দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন? যদি তাহা হয়, তবে চক্ষে অবিরল বারিধারা পতিত হইতেছে কেন; তাঁহার চিত্তে এমন কি বৈকল্য ভাবের উদয় হইয়াছে যে, কোন দিকে আর ভ্রূক্ষেপ নাই? তাঁহার হৃদয়ে কি ভয় নাই? এই ভয়ানক অন্ধকার, এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জন, এই ভীষণ বায়ুপ্রবাহ দেখিয়া কি তাঁহার মনে কিছু মাত্র শঙ্কার উদয় হইতেছে না?

না, অদ্য যুবক নির্ভীক্। কারণ তাহার জীবনরূপ সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। যাহার মনে আশা নাই, যাহার অন্তঃকরণে সুখ নাই, যাহার জীবনে মায়া নাই, তাহার আবার ভয় কিসের? তাই পাঠক! আজ তাঁহাকে নির্ভীক্ দেখিতেছেন।

যুবক চিন্তিত অন্তঃকরণে নৌকা হইতে নামিয়া, অগ্রে অগ্রে পাদ বিক্ষেপ করিতে করিতে, এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে নিশাকাল, আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় পরিপূর্ণ তাহাতে আবার বিজন অরণ্য। এত অন্ধকার যে, নিকটস্থ তরুরাজী পর্য্যন্তও দেখা যাইতেছে না। সামান্য শুষ্কপত্রের পতনধ্বনীতে মনে ভয়ের উদয় হয়; কিন্তু যুবার মনে কিছুমাত্র ভয় নাই।

এই ভাবে অন্ধকারময়ী রজনীতে সুবিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রান্তি দূরকরণ আশয়ে এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন তিনি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু সহচরী চিন্তাদেবী তাঁহাকে সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্রমে চিন্তা, উদ্বেগ ও যন্ত্রণা শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলিল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী যুবকের অসহ্য কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়াই যেন তাঁহার আঁখিদ্বয় নিমিলিত করিলেন যুবক ধরাতলে পতিত হইয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। নভোমণ্ডলস্থ মেঘমালা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া চতুর্দ্দিক্ আরও অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রাম, নগর, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদ, নদী কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবলমাত্র তীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় খদ্যোতমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া যেন হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। যুবক অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া শরীর এতদূর ক্লিষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহার শরীরের উপর দিয়া মুষলধারে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, তিনি তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

ক্রমে বৃষ্টি থামিল। প্রকৃতি-দেবী আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আকাশ পরিষ্কার, সমীরণ আবার মৃদুমন্দ গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গোমতী নদীও আবার কল্ কল্ রবে প্রেমসঙ্গীত গাহিতে লাগিল। এই মধুর জগতে আবার সবই মধুময়।

রজনী অবসান হইয়াছে। প্রভাতের তরুণ-অরুণকিরণ দিক্‌দিগন্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যুবকের কুঞ্চিত ললাটে রবিকরোত্তাপ পতিত হওয়ায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, পরিধেয় বস্ত্র সমুদায় জলে আর্দ্র হইয়াছে। নিকটস্থ তরুরাজী সমুদায় তরুণ-অরুণ-কিরণে স্বুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানাবিধ পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু চলিবার ক্ষমতা নাই। শরীর নিতান্ত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুরই স্থিরতা নাই। ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন যে, আজ হইতে আমি পথের ভিখারী। লোকালয়ে আর এ মুখ দেখাইবার আবশ্যক করে না। যতদিন বাঁচিব, নির্জ্জনে বসিয়া চিত্তসংযম করিব। চিত্তসংযম মহাধর্ম্ম। যদি চিত্তসংযম করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় লোকালয়ে এ পাপমুখ দেখাইব; নচেৎ চিত্তসংযম ব্রতে ব্রতী হইয়া এ পাপ জীবন ক্ষয় করিব। এই বলিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগপূর্ব্বক আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে এক নির্জ্জন কুটীর তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। যুবক ক্রমশই কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুটীরমধ্যে এক পরম যোগী ব্রহ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত। যুবক তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যোগী উপাসনান্তে যুবককে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। যুবকের মন এরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, এতাদৃশ সময় যোগীর সহিত অধিক বাক্যালাপ করিতেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন।

কিছুদিন সহবাসেই যুবকের মন কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দেখিলেন, যোগীর গলায় ও হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা, শিরে জটাজাল, পরিধান গেরুয়া বসন এবং সর্ব্বদা যোগ ও শাস্ত্রালাপনে নিযুক্ত। কাহারও সহিত অধিক বাক্যব্যয় করেন না। সর্ব্বক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরারাধনা-কার্য্যে নিমগ্ন। যোগী তাঁহাকে পরম যত্নে আপনার আশ্রমে রাখিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প যোগ শিক্ষা দিয়া কথঞ্চিৎ তাঁহার চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিলেন।

জগৎপাতা জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কোথায় আজ যুবক যৌবনোচিত বিলাসব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া অঙ্গের শোভা বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইবেন! না, তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গে ভস্মরাশি বিলেপন করিয়া কঠোর তাপস-ব্রতাবলম্বনে ব্রতী! কোথায় চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সুখসেব্য দ্রব্যসমূহের রসাস্বাদনে নিযুক্ত হইয়া রসনার পরিতৃপ্ততা সম্পাদন করিবেন! না, তৎপরিবর্ত্তে কটু, তিক্ত, কষায়াদি বন্য ফলমূলই তাঁহার জীবনোপায়! কোথায় বিবিধ বিলাস দ্রব্যে গৃহ সুসজ্জিত করতঃ দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেন! না, কোথায় নানাবিধ বিপদসঙ্কুল তরুরাজীপরিবেষ্টিত বিজন কুটীরের ভূমিতলে শয়ন! কোথায় আজ বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা-

বিধ সুশ্রাব্য সুমধুর সঙ্গীতে শ্রবণযুগলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিবেন! না, কোথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ আরণ্য জীবগণের বিকট গর্জ্জন শ্রবণে নিযুক্ত।

পাঠক! যুবকের এতাদৃশ বৈরাগ্যভাবের কারণ কি বুঝিতে পারিযাছেন? যুবকের এতাদৃশ বৈরাগ্য ভাবের কারণ একমাত্র রমণীর প্রেমলাভে বঞ্চিত।

প্রেমের কি প্রবল পরাক্রম! যে যুবকের হৃদয়ে কখনও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ভাব লক্ষিত হয় নাই, যে হৃদয় অচলের ন্যায় সর্ব্বদা অটল ছিল; আজি সে হৃদয়ও চঞ্চল হইল। তাই আজ যুবক, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিজন কুটীরাভ্যন্তরে চিত্তসংযমে নিযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পল্লীর জমীদার।

আনন্দনগর হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ অন্তরে কুসুমগ্রাম। এখানে অমরেন্দ্র বাবুর বাস। অমরেন্দ্র বাবু এখানকার খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমীদারী আছে। দোতালা চক্‌মিলান বাড়ী, দপ্তরখানা, কাছারি বাড়ী ও অতিথিশালা। বাটীর পশ্চাৎভাগে বাগান ও খিড়কীর পুষ্করিণী। বাগানের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর।

অমরেন্দ্র বাবুর বাস্তবাটীখানি খুব বৃহৎ। বাটীখানি বড়লোকদিগের প্রথামত দ্বিতল, চারিদিকে চক্‌। ঘরগুলিন খুব প্রশস্ত ও পঙ্খের কাজ করা এবং নানাপ্রকার মনোহর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুসজ্জিত। জানালাগুলিতে সার্সি ও খড়খড়ি লাগান। মধ্যে

বড় উঠান ও সম্মুখে পূজার দালান। এ মহলে কেহ বাস করে না; সুতরাং অধিকাংশ সময়ই প্রায় অপরিষ্কার থাকে। মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডের সময় পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। দোল দুর্গোৎসবের সময় বড়ই ধুমধাম। ঘরবাড়ী সমুদায় মেরামত হইতে থাকে। সেই সময় বাড়ীখানি যেন হাস্যময়ী হইয়া উঠে। অপরাপর সময়ে ঠাকুর-দালান চামচিকা, পায়রা ও চড়ুই প্রভৃতি পাখিতে পরিপূর্ণ থাকে। ঠাকুর দালানের পার্শ্বস্থ ঘর সমুদায় ঝাড়, লণ্ঠন, সতরঞ্চ, গালিচা, প্রভৃতি পূজার আসবাবে পরিপূর্ণ এবং বৃহৎ বৃহৎ তালা দ্বারা আবদ্ধ।

ঠাকুরদালানের পার্শ্বেই অমরেন্দ্র বাবুর শয়ন ঘর। এই ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমধিক প্রশস্ত। চারিধারে পঙ্খের কাজকরা। দেয়ালে সারি সারি হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। মন আর্দ্ররসে ডুবিতে থাকে। গৃহের মধ্যস্থলে দুই খানি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানা কারুকার্য্য-খচিত পালঙ্ক অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে। তদুপরি দুগ্ধফেণ-নিভ সুকোমল শয্যা। এই ঘরে তাঁহার জননীর একখানি প্রতি-মূর্ত্তি যথাস্থানে সুসজ্জিত। অমরেন্দ্র বাবু অতিশয় মাতৃভক্ত। তিনি জগতের মধ্যে জননীকে সর্ব্বশ্রেষ্ট বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব্বদা বলিয়া থাকিতেন যে, "যাঁহা হইতে এই জগৎ-সংসার দেখিতে পাইলাম, যাঁহা হইতে এই সমুদায় বিপুল ধনের অধিকারী হইলাম, যাঁহা হইতে এই অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী সহধর্ম্মিণী পাইলাম, যিনি দেবীর দেবী, ঈশ্বরীর ঈশ্বরী; তাঁহা অপেক্ষা জগতে শ্রেষ্ঠ কে আছে? যে মহাত্মা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি" এই বাক্যটি লিখিয়াছেন তিনিই জগতের সুপুত্র।" জননীর প্রতিমূর্ত্তি খানি এরূপভাবে অবলম্বিত যে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্ট হয়। তিনি অগ্রে জননীর পাদপদ্ম দর্শন করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন; এবং তৎপরে বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হন।

বাটীর অনতিদূরেই অমরেন্দ্র বাবুর অতিথিশালা। এ মহল্লা সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ। কি দিন, কি রাত্র অষ্ট প্রহরই লোকজন যাতায়াত করিতেছে। কত লোক আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। নিত্য নিত্য শত শত লোক অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কেহ বা দুই এক দিবস অবস্থান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অনেক তিলকধারী বৈষ্ণব কেহ বা হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতেছে; কেহ বা ভাবে বিভোর হইয়া বাহু তুলিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে। অতিথিশালায় কোন সন্ন্যাসী অঙ্গে ভস্ম লেপন করিতেছেন; কেহ বা গাঁজা টিপিতেছেন, কেহ বা চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন; কেহ বা অগ্নিকুণ্ড পরিবেষ্টিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

অমরেন্দ্র বাবুর অতিথিশালার গায়েই পাকশালা। এখানেও সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ। কেহ বা শাক সবজী পরিবেষ্টিত হইয়া, রাগে অন্ধ হইয়া যেন সেই সমুদায় নিরীহ সামগ্রীর উপরই বল প্রকাশ করিতেছেন, কেহ বা জীবিতমৎস্য হননে নিযুক্তা। কেহ বা স্বীয় পুত্রকে স্তনপান করাইতেছেন; কেহ বা কোন্দল করিবার চেষ্টায় আছেন।

পাকশালার পরেই খিড়কীর বাগান ও পুষ্করিণী। বাগানটী বেস পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কোথাও বা লতামণ্ডপ, কোথাও বা কামিনী-কুঞ্জ, কোথাও বা নানাবিধ বৃক্ষরাজী পরিশোভিত উপলখণ্ড। অমরেন্দ্র বাবুর বাগানের প্রতি বড় সখ। তিনি নানাদেশ হইতে নানা প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, আনয়ন করাইয়া খিড়কীর বাগানে রোপণ করিয়াছেন। বাগানের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ সরোবর। সরোবরের জল অতি পরিষ্কার। পুষ্করিণীতে একটি মাত্র শৈবাল বা পানা নাই। এই জলে অমরেন্দ্র বাবুর সংসারে পানীয় ও রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাটীর স্ত্রীলোকেরা ইহাতে স্নান আহ্নিকাদি সম্পাদন করেন।

পাঠক! এতক্ষণ কেবল অমরেন্দ্র বাবুর বাটীর বিষয় বলিয়াছি,

এক্ষণে তাঁহার রূপ গুণের পরিচয় দিয়া আপনাদিগের চিত্তের কথঞ্চিৎ প্রশমতা করি।

অমরেন্দ্রবাবু দৈর্ঘ্যস্ত গৌরবর্ণ। দেহ সুগোল, আকৃতি নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব। ললাট প্রশস্ত; যুগ্ম ভ্রূ, হস্তপদাদি সুগোল। চেহারাখানি দেখিলে শরীরে বিলক্ষণ বল আছে বলিয়া বোধ হয় এবং মনে ভক্তিরসেরও উদ্রেক হয়। বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর; কিন্তু আকার দেখিলে ৩০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। অমরেন্দ্র বাবু বিদ্বান বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী।

মানবগণ সুখের জন্য সংসারী হয়। সে সুখের মূলাধারই সতী সাধ্বী স্ত্রী। মানবের পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী অপেক্ষা জগতে কি সুখের জিনিষ আছে? যদিও অমরেন্দ্র বাবুর এখন আর সে যৌবনাবস্থা নাই সে যৌবনোচিত হর্ষ, প্রফুল্লতা নাই, যদিও প্রাণে এখন পূর্ব্বের ন্যায় সুখভোগের বাঞ্ছা নাই, যদিও চক্ষে এখন তাদৃশ প্রখর জ্যোতিঃ নাই, যদিও রসনায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় রসের কণা নাই, যদিও মুখে এখন পূর্ব্বের ন্যায় হাসি নাই, যদিও হৃদয়ে এখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা নাই; তথাপি, তিনি সেই সর্ব্বসুখের আধার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, পতিপরায়ণা, সতী সাধ্বী রমণী-রত্নে ভূষিত। সতী সাধ্বী স্ত্রী সংসারের ভূষণ স্বরূপা।

অমরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণীর নাম মনোরমা। মনোরমা পতিপরায়ণা ও অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। যেরূপ রূপসম্পন্না হইলে স্ত্রীলোককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখায়, আমাদের মনোরমাও তৎসমুদায়ে গঠিতা। মনোরমা যে কেবল অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী ছিলেন এমন নয়; অসামান্যা গুণবতীও ছিলেন। তিনি লেখাপড়া প্রভৃতি সদ্গুণে অলঙ্কৃতা। কি গৃহ কার্য্যে, কি শিল্পকর্ম্মে, কি সেবাশুশ্রূষায় কি সংগীত বিদ্যায় সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। রন্ধন কার্য্যেও তাঁহার খুব হাত যশ। গৃহধর্ম্মে কখনও তিনি কোন প্রকার ঔদাস্য

করিতেন না। কখনও ক্ষণকালের জন্য এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া গল্প করিতেন না। সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃতা।

অমরেন্দ্র বাবুর অভাবের মধ্যে একটি ছিল,—তিনি পুত্রধনে বঞ্চিত ছিলেন। যাহা হউক, তিনি একেবারে নিঃসন্তান ছিলেন না; কেন না, বিধাতা তাঁহাকে একটি অসাধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যারত্ন দান করিয়াছেন। কন্যাটীর নাম কুসুমকুমারী; বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেমাঙ্কুর।

এই নিখিল বিশ্বসংসারের মধ্যে এমন কি জিনিস আছে যে, যাহা পাইলে মনুষ্য এই ধরাধামকে স্বর্গ বলিয়া মনে করে,—এমন কি গরল আছে, যাহার আস্বাদনে অহরহঃ মর্ম্মযাতনায় অস্থির করে,—এমন কি প্রজ্জ্বলিত হুতাশন আছে, যদ্দ্বারা মানবের হৃদয় ও মন দগ্ধ করিয়া ফেলে। ইহার নাম প্রণয়।

জগতে এমন কে আছে যে, তাহার হৃদয়ে কোন না কোন সময়ে প্রণয় সঞ্চার হয় নাই? কি ধনী, কি দুঃখী, কি ভদ্র, কি ইতর, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। প্রণয়! কার সাধ্য তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে? কার সাধ্য তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা করে? প্রণয়! তুমি নানা স্থানে নানা অবতার রূপে জন্মগ্রহণ কর। পুরাণে শুনিয়াছি যে, পতিতপাবন স্বয়ং ভগবানই নানা অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রণয়! তুমি কি সেই পতিতপাবন ভগবান? না, তাঁহার অংশ? তুমি যে হও, তোমায় শত

শত বার নমস্কার করি। প্রণয়! তুমি ভক্তিরূপিণী রূপে হৃদয় মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহপাশে আবদ্ধ কর। তুমি ভালবাসা রূপে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রীর প্রেমপাশে আবদ্ধ কর। তুমি স্নেহরূপিণী রূপে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া পুত্র কন্যা প্রভৃতিগণের—ভক্তিপাশে আবদ্ধ কর।

"প্রণয় দুই প্রকার।" "অকৃত্রিম ও স্বার্থপর।" "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়াও হৃদয় মাঝে প্রেমকে বদ্ধমূল করিয়া রাখে,"—যে ব্যক্তি আত্মসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীর সুখের জন্য তাহার অভিলষিত বস্তুর সহিত সংঘটন করাইয়া দেয়,—যে ব্যক্তির প্রণয় পর্ব্বতের ন্যায় চিরকাল অটল থাকে, তাহারই প্রেম প্রেম নামের যোগ্য। সেই প্রেম অকৃত্রিম!

যে ব্যক্তি আত্মসুখের জন্য ভালবাসে, যে ব্যক্তি দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভালবাসে, যে ব্যক্তি দোষাদোষ, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া বাহ্যিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে, যে ব্যক্তি প্রণয়িনীর অনিচ্ছাসত্বেও ভালবাসে, সে প্রেম প্রেমনামের অযোগ্য। ইহারই নাম স্বার্থপর-প্রেম।

প্রণয় দুঃখের ভিন্ন সুখের নহে। প্রণয়! তুমি মানবের জীবন-রূপ কুসুমোদ্যানে সুতীক্ষ্ণ কোমল কণ্টক; তুমি বিশ্বমাঝারে প্রধান বন্ধন; তুমি সাধুর পক্ষে চক্ষের শূল, অসাধুর পক্ষে দুঃখের মূল।

কুসুমকুমারী এক্ষণে বালিকা নয়। একটী অপরিস্ফুট গোলাপ-কলিকা,—আধ আধ ফুটিয়াই কত মধুর হইয়াছে।

পাঠক! একবার এই গোলাপ-কলিকার প্রতি অবলোকন করিয়া দেখুন, বালিকার হৃদয়ে এখন সুখ নাই। বালিকার হৃদয়ে প্রণয় অঙ্কুরিত হইয়াছে। বালিকার হৃদয়ে প্রেমের প্রখর জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছে। সরলা বালিকা এতদিন কিছুই জানিত না। আপন মনে খেলা করিয়া বেড়াইত, আপন মনে খাইত, আপন মনে শয়ন করিত। এখন

আর সে দিন নাই, সে বাল্যকাল নাই, সে ধূলিখেলা নাই, সে পুতুল-খেলা নাই; এখন আর সে খেলা ভাল লাগে না, এখন আর মনে শান্তি পায় না। এখন যেন বালিকার হৃদয় কাহার আদর, কাহার ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে। সেই আদর, সেই ভালবাসা পাইবার জন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বালিকা আজ অন্তঃপুরস্থ কুসুমোদ্যানে অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্না।

সন্ধ্যা আগত। সান্ধ্যগগণে রক্তিম মেঘমালা সুবর্ণ বর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়াভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। কমলিনী সতী পতিবিরহে অনন্যগতি দেখিয়া মনের দুঃখে মুখখানি ম্লান করতঃ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে। রাখালেরা গো-পাল লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। বালক বালিকারা খেলা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব জনকজননীর ক্রোড়ে যাইবার উপক্রম করিতেছে। কোন কোন অবলা সরলা বালা বিরহজ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহের মালা গাঁথিয়া নিশীথে স্বীয় নাথের গলায় পরাইয়া সোহাগ করিবে বলিয়া কুসুমচয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুরবাসিনীরা প্রদীপ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল। একে একে নক্ষত্ররাজী উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় গগনে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজীর সৌগন্ধে দশদিক আমোদিত করিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে বৃক্ষশির, লতা, পল্লব, সরোবরের নীল জল যেন হাসিতে লাগিল। এখন আর কুলকামিনীরা কক্ষে কলস লইয়া হেলিতে দুলিতে যাইতেছে না, রূপের ছটায় পথঘাট আলোকিত করিতেছে না; হস্ত নাড়িয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী দেখাইতেছে না, এখন আর ধীরচলনে ফুল্লমনে গৃহে গমন করিতে পারিতেছে না।

এই সুমধুর জ্যোৎস্নালোকে কুসুমকুমারী কখনও বা ফুল চয়ন করিতেছেন, কখনও বা মালা গাঁথিতেছেন, কখনও বা মৃদু মৃদু স্বরে গান গাহিতেছেন, কখনও বা সরোবরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, কখনও বা কাহার অপেক্ষায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"কুসুম"।

কুসুম হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে অবলোকন করিয়া দেখিল যে নলিনীকান্ত! নলিনীকান্তকে দেখিয়া বালিকার মুখখানি আরও সলজ্জ ভাব ধারণ করিল। মুখে কথা নাই।

নলিনীকান্তও অবাক্!

অভিধানে কি শব্দ নাই? তাহাদের মুখে কি কথা নাই? যদি থাকে, তবে তাহারা নিঃশব্দে আছে কেন? চক্ষের দেখা দেখিবার নিমিত্ত যাহাদের মন উন্মত্ত, তাহারা আবার কথা কহিবে কি প্রকারে?

এই সুমধুর জ্যোৎস্নালোকে যুবকযুবতীর অপূর্ব্ব মিলন কি মধুর! এ সময়ে স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট বসিয়া থাকা কি সুখকর! জগতে যদি সুখ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে এই ভালবাসা——জগতে যদি কোন পবিত্র বস্তু থাকে, তবে এই ভালবাসা——জগতে যদি কোন অমূল্য রত্ন থাকে, তবে এই ভালবাসা——জগতে যদি স্বর্গ বলিয়া কোন সুখময় ধাম থাকে, তবে এই ভালবাসা——কি ছার সংসার! কি ছার জীবন! কি ছার ঐশ্বর্য্য! কি ছার মান! কি ছার প্রাণ! এ সুখের কাছে কি কিছুরই তুলনা হইতে পারে?

পাঠক! আমাদের যুবকযুবতী আজ এই ভালবাসার প্রেমে অন্ধ, নিস্পন্দ ও বাক্‌শক্তিহীন। নহিলে কথা কহিবে না কেন?

যুবক কে বুঝিতে পারিয়াছেন কি? কুসুমকুমারীর হৃদয়ের হৃদয় নলিনীকান্ত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

কুসুমকুমারী স্বীয় শয়নকক্ষে বিমর্ষচিত্তে উপবিষ্টা। তাঁহার করতলে কপোল সংলগ্ন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার অস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছেন।

না হেরে তাহারে মম প্রাণ যে কেমন করে।
কি জানি কি করে প্রাণ সেই রূপ দেখিবারে॥

তাই ত! সই ও এখন এলো না? আহা! এই সময় যদি সই আস্‌তো, তা হলে মনটা কতক সুস্থ হতো। আমি এমনই অভাগিনী যে চক্ষুলজ্জার ভয়ে একটা কথাও কইতে পাল্লুম না! যত লজ্জা কথা কহিবার সময়! এখন যদি কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে জানিতে পারে, আমি বোবা কিনা! আহা! এই গানটি আমার অতি মধুর লাগিয়াছে। আবার গাই, আবার প্রাণকান্তকে স্মরণ করি।

না হেরে তাহারে মম প্রাণ যে কেমন করে।
কি জানি কি করে প্রাণ সেই রূপ দেখিবারে।
বারণ না মানে আঁখি, ইচ্ছা করে সদাই দেখি,
হৃদি পিঞ্জরে রাখি দিবানিশি হেরিবারে॥

গীত গাহিতে গাহিতে কুসুমকুমারীর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ২।১০ ফোটা পড়িল। এমন সময় একজন ষোড়শ বর্ষীয়া কামিনী কুসুমের অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুইটী ধরিল।

কুসুম কহিল, "কেও সই ?"

সই। সই! সই! সই!
দুটো প্রাণের কথা কই।
সই কাঁদচিস্ কেন সই ?
সই! খুলে বল না সই।

কুসুম। কি আর কহিব সখি, সুখের বারতা ;
অভাগিনী, অনাথিনী আমি কাঙ্গালিনী.
যাপিতেছি সারা নিশি জাগিয়া যামিনী,
বুঝেও বুঝে না মন না মানে সমতা।

সই। অকস্মাৎ! একি হেরি স্বপনের প্রায়,
বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল এখনি
অকস্মাৎ! একি ভাব উদিল সজনী
তাই ভেবে, সখি তুমি কর হায় হায়।
অভাগিনী, অনাথিনী তুই লো সজনী ?
কিসের লাগিয়া তুমি কাঁদিতেছ এত ?
অনুপম রূপ শোভা ধরিয়াছে কত,
মুক্তাফল সম বিন্দু ঝরিছে যখনি।

কুসুম। কে আছেরে অভাগিনী আমার মতন,
একাকিনী বিরলেতে বসি অবিরত
নয়ন সলিলে হৃদি ভাসিছে সতত.
দিবা নিশি অন্তর্জ্বরে হতেছি দাহন।

সই। কিসের লাগিয়া সখি ভাবিতেছ এত ?
অনুমান বুঝি, সখা গিয়াছে চলিযা,
কাঁদায়ে তোমারে হেথা একাকী ফেলিয়া,
তাই বুঝি ঝরিতেছে বারি অবিরত ?

কুসুম। কেন মিছে সখি মোরে দিতেছ যাতনা ?

জ্বলিতেছে, যে অনল দিবা নিশি হায়,
কহিতে বিদরে বুক কব আর কায় ;
তুমি মোর প্রাণ সখি বুঝেও বুঝনা ;

সই — স্মরি নাহি উপহাস, ওলো বরাননি !
কি কারণে হৃদি তব হতেছে দাহন ?
সবিশেষ কহ মোরে সজনী এখন,
থাকে যদি পথ কিছু কব চন্দ্রাননী।
তোমার কারণে সখি, নাহি হেন কাজ,
যে কাজ সাধিতে, আমি না করি যতন ;
কেন তুমি ফেলিয়াছ সমুদায় সাজ ?
কি হেতু লো বিধুমুখি বিষাদিত মন ?
কহ ত্বরা করি মোরে, দিও না লো ব্যথা ;
আমিও তোমার লাগি সতত ব্যথিত ;
বিলম্ব না সহে প্রাণে, ঘটনা অতীত
শীঘ্র করি কহ মোরে, খাও মোর মাথা।

সই ! আমারি নিকটে প্রকাশ করিতে এতদূর শঙ্কিত হচ্চো কেন ?

কুসুম। সই ! শুনবি ? আমি ভাই বসে আছি, হাতে এই বইখানা আছে, তোর সয়া এলো। কথায় কথায় পোড়া রূপের কথা এল। আমার রূপের কথা নিয়ে যে কত ব্যাখ্যানা কর্‌তে লাগ্‌লো, কত যে কি বল্‌তে লাগ্‌লো তা ভাই আর কি বলবো। কখনও বল্‌তে লাগ্‌লো ভাই, "আহা ! কি আযতনয়ন ! কি বালারুণদীপ্ত-ফুল্ল-নলিনীসদৃশ মুখখানি ! কি নবনীরদবিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি ! কি সুন্দর কপালফলক ! কি আবক্র যুগ্ম ভ্রূ ! কি নধর অঙ্গসৌষ্ঠব ! আহা ! কি মৃগনয়নের চঞ্চল কটাক্ষ ! কি ভুবন ভুলান রূপ ! এ অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী কি এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে আছে ? কত পুণ্য করিলে এ দুর্লভ রত্ন পাওয়া যায়।" পোড়া রূপের ব্যাখ্যানা

শুনে লজ্জায় মরি। ছাই! পোড়া মুখ দিয়ে, কি একটা কথাও বেরুলো না? কথায় বলে না ভাই, "রমণীর বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"। আমারও হয়েছে তাই। বলি বলি মনে কচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পোড়া কথা বেরুলো না।

সই। তার পর!

কুসুম। তার পর বল্লে ভাই, "কুসুম! তুমি কি আমায় ভালবাস?" "কুসুম! আমার ভালবাসার কি প্রতিদান পাইব?" আমি ভাই আর কি বল্‌বো। মনে হতে লাগ্‌লো, যদি এ হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম কুসুম তোমায় কতদূর ভালবাসে। কুসুমের হৃদয় তোমার জন্য কতদূর কাতর। আমি ভাই চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সই। তুই কেন ভাই, সথার কোলে উঠে বস্‌তে পাল্লি নে? আর আস্তে আস্তে তার গালটি ধরে একটু সোহাগ বাড়াতে পাল্লি নে? আমি হলে তার উচিত শাস্তি দিতুম।

কুসুম। কি কর্‌তিস্ ভাই, বল্ না?

সই। কি কর্‌তুম, তা ভাই পরে বল্‌বো। এখন তার পর কি হলো?

কুসুম। তার পর, কল্লে কি ভাই, এই দোয়াত থেকে, কলমে করে একটু কালি নিয়ে, আদর করে আমায় এই টিপটি পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "কুসুম! তোমার নিকট আমি আমার মন হারাইয়াছি, হৃদয় হারাইয়াছি, শান্তি হারাইয়াছি, পৃথিবীর সুখ হারাইয়াছি, শয়নে স্বপনে কেবল তোমার ওই কুসুম-প্রতিমাখানি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। কুসুম! যত দিন না তোমার মনোগতভাব অবগত হইতে পারিব, ততদিন আর তোমাকে আমার বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিব না। কি জানি, যদি তুমি আমাতে অনুরক্তা না হও, কি জানি, যদি তুমি অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, কি জানি,

যদি অপর কেহ তোমাকে আমা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ঘোর অধর্ম্ম করিয়াছি, ভয়ানক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র ক্ষমা। যদি আমি সেই পাপে লিপ্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর ভাল, নচেৎ চিরকাল অনুতাপানলে দগ্ধ হইব" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

সই। বটে, এতদূর! তা এতক্ষণ কেন আমায় বলিস্ নি? যেমন সয়া আজ আমার সইকে কাঁদাইয়াছে, তেমনি আজ তাঁর নাকের জলে চকের জলে করে ছাড়বো। না করতে পারি, তবে আমার নাম হেমপ্রভাই নয়। এই বলিয়া ত্বরিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পাঠক! এতক্ষণে এ যুবতী কে, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন? যুবতীর নাম হেমপ্রভা, কুসুমকুমারীর সই।

এক্ষণে, এই যুবতীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

হেমপ্রভা অমরেন্দ্র বাবুর দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্কন্যা। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। সংসারে এমন কেহই নাই যে, এই অনাথা বালিকাকে লালন পালন করে। অমরেন্দ্র বাবু, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে এই অনাথা কন্যাটিকে আপন আলয়ে আনাইয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। স্বীয় দুহিতার ন্যায়, স্নেহে ও যত্নে, হেমপ্রভা শশীকলার ন্যায়, দিনে দিনে, তাঁহার আলয়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কুসুমকুমারী ও হেমপ্রভা উভয়েই সমবয়স্কা। বাল্যকাল হইতে উভয়েই একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, একত্রে উপবেশন করেন। একত্রে সহবাসজনিত উভয়ের মনে অকৃত্রিম সৌহৃদ্য ভাব জন্মিল। কেহ কখন কাহারও সহিত কলহ করে না। কেহ কাহারও প্রতি

কখন ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে না। সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে অনুরক্তা। বাস্তবিক এই দুইটিকে দেখিলে বোধ হয় যে, উভয়েই এক প্রাণ ও এক-চিত্ত; কেবল ভিন্ন দেহ। একজনকে অপর জন দেখিতে না পাইলে কাঁদিতে থাকে, ভাবিতে থাকে এবং কিছুই খাইতে চায় না। কোন দ্রব্যেই তাহার সুখবোধ হয় না। আবার যখন পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন উভয়েই উভয়ের গলা জড়াইয়া কত সুখানুভব করিতে থাকে। যদি অমরেন্দ্রবাবু কোন ভাল খাদ্যদ্রব্য আপন কন্যা কুসুমকুমারীকে দেন, কুসুম অগ্রে তাহার অর্দ্ধেক হেমপ্রভার জন্য তুলিয়া রাখে। পরে যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অগ্রে তাহাকে সেই ভাগ দিয়া আপনি খাইতে থাকে। সে না খাইলে আপনি খায় না, অমনি কাঁদিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হেমপ্রভা না খাইতে থাকে, ততক্ষণ কেবল তাহাকে অনুরোধ করে ও মুখপানে চাহিয়া থাকে।

আহা! জগতে এই অকৃত্রিম স্নেহ কি সুখের আকর! যিনি এই অকৃত্রিম বাল্যস্নেহ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, জগতে ইহার ন্যায় বিমল সুখ আর কিছুই নাই। যিনি এ সুখে বঞ্চিত, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

"চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

আশার প্রভাব কি চমৎকার! জগতের যাবতীয় পদার্থই আশার অধীন। জগতে, যদি আশা বলিয়া কোন জিনিস না থাকিত, তাহা হইলে মানবগণ কখনই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত না। মানব, আশার চির-সহচর। মানবের মন আশাকাঙ্ক্ষী। মানবের জীবন আশার আজ্ঞাবহ। মানব, সকল জিনিসই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কুহকিনী আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে দিন মানব-হৃদয় হইতে আশা দূরীভূত হইবে, সেই দিবস হইতে সে জীবিতে মৃত-প্রায় হইবে। আশা! তোমার কুহক কি চমৎকার! তোমার ক্ষমতা কি অলৌকিক! তোমার আশ্রয়ে মানব জীবন ধারণ করিতেছে, আবার জীবনে মৃতপ্রায় হইতেছে। তুমি সময়ে মানবকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছ, আবার পরক্ষণেই ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতেছ। তুমি সময়ে মানব-হৃদয়ে কত সুখ, কত সান্ত্বনা প্রদান করিতেছ, আবার পরক্ষণেই কত দুঃখের কারণ হইতেছ।

মানবহৃদয় অতিশয় দুর্ব্বল। আশা! তুমি সেই দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কত লীলা খেলাই দেখাইতেছ। রে কুহকিনী আশা! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ্ যে, তোর কুহকে পতিত হইয়া যুবা নলিনীকান্ত কি করিতেছে?

নলিনীকান্ত কুসুমকুমারীর শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় শয়ন কক্ষে বসিয়া, অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন। পাচক আসিয়া খবর দিল, বাবু অন্ন ব্যঞ্জন সমুদায় প্রস্তুত। নলিনীকান্ত, ক্ষুধা নাই বলিয়া

পাচককে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পাচক চলিয়া গেল।

নলিনীকান্ত কি চিন্তা করিতেছেন? কে বলিবে,—কি চিন্তা করিতেছেন! এ কি প্রেমের চিন্তা? প্রেমের চিন্তায় মুখ ম্লান হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হয়। জগতের কোন দ্রব্যই সুখ বোধ হয় না! এ কি সেই চিন্তা? যুবার মুখও ত ম্লান বোধ হইতেছে! যুবারও ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিতেছি না।

পাঠক মহাশয়! আপনি কখন কি কোন রমণীর প্রেমে পড়িয়াছেন? কখন কি কোন রমণীরত্ন দেখিয়া আপনার হৃদয় সহসা চঞ্চল হইয়াছে? আপনি কি কখন কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন? কখন কি কোন শারদ-শশাঙ্ক-সদৃশ বদনইন্দু দেখিয়া, আপনার প্রেমের পুত্তলি বলিয়া গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নলিনীকান্তের মনোভাব কিছু কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, আমাদের অদৃষ্টে এরূপ সুখ কখনও ঘটে নাই। সুতরাং নলিনীকান্তের হৃদয়চাঞ্চল্যের কারণ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। এ দোষ আমাদের নয়; আমাদের অদৃষ্টের।

নলিনীকান্তের মনে বড় আশা ছিল যে, কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়। যদি তাহা না ঘটে, তাহা হইলে তিনি চিরকালই অবিবাহিত থাকিবেন। কুসুমের পিতা, তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিবে কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। তথাপি মনে মনে অনুমান করিয়া আসিতেছিলেন যে, যদি অমরেন্দ্রবাবু কন্যা সম্প্রদান করেন ত আমাকেই করিবেন। নলিনীর এরূপ আশা, তাহার ভালবাসার কল্পিত ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কন্যা সম্প্রদানের ভার অমরেন্দ্রবাবুর উপর। তিনি যাহাকে দান করিবেন, কুসুম তাহারই হইবে। এক্ষণে নলিনীর আশা আশাই নহে—এক প্রকার "আকাশ-কুসুম।"

নলিনীকান্ত কখনও চিন্তা করিতেছেন যে, মনের আবেগে আজ কুসুমকুমারীর নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলিয়াছি। কুসুম কতদূর অপ্রতিভ, হইয়াছে! সেই মূর্ত্তিমতী সরলা কত্তু কি মনে করিতেছে! তাহার নিকট এতদিন পরে আজ ধরা পড়িয়াছি। আমার এরূপ কার্য্য করা অতি গর্হিত হইয়াছে। সেই কনকপ্রতিমা যদি আমায় ভাল না বাসে, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে কি হইবে! আমি কি চিরকালই অবিবাহিত থাকিব? চিরকাল তুষানলে এ হৃদয়কে কি দগ্ধীভুত করিয়া ফেলিব? যে প্রেমকে এ হৃদয়ে একবার স্থানদান করিয়াছি, তাহাকে কি এ হৃদয় হইতে, একেবারে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিব? হা বিধাতঃ! কেন আমায় এমন করিলে?

মানবের মন কখন যে কিরূপ হয়, তাহা বর্ণনা করা মানবের সাধ্য নহে। মানবের চিত্ত, প্রতি ক্ষণে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব অবলম্বন করিতেছে। কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে।

নলিনীকান্ত চিন্তা হইতে অবসর লইবার জন্য, নিঃশব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। কিন্তু কই! চিত্তের ত সমতা হইল না? কই! মন ত প্রবোধ মানিল না? মন প্রবোধ মানা দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর দুঃখোচ্ছ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক চিন্তায় তিনি অস্থির; তাহার উপর নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি চিন্তায় তাঁহাকে এরূপ অবসন্ন করিয়া ফেলিল যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পর্য্যঙ্কে শুইয়া পড়িলেন। দরদরিত অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া গেল। পাঠক! হয়ত আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নলিনীকান্ত কুসুমকুমারী ভিন্ন কি আর সুন্দরী রমণী পাইলেন না যে, তিনি বিবাহ করেন? জগতে কুসুমকুমারী অপেক্ষা কত শত সুন্দরী রমণী আছে। বড় লোকের ছেলে, বিবাহের জন্য এতদূর উতলা হওয়া কি উচিত? কুসুমকুমারী ভিন্ন অপর কাহাকেই

বিবাহ করিব না ; এ কোন্ দেশী পণ ? এ কোন্ দেশী প্রথা ? এ কোন্ দেশী নিয়ম ? তাহার উত্তর এই; যে যাহাকে একবার প্রাণভরিয়া ভাল বাসিয়াছে, যে যাহাকে একবার হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে, যে যাহাকে একবার চিরজীবনের সহচর বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, যে যাহার সঙ্গে একবার প্রাণভরিয়া কথা কহিয়াছে, যে যাহাকে ক্ষণকালের জন্য না দেখিলে জগৎ অন্ধকারময় দেখে ; তাহাকে চিরকালের জন্য অপরের অঙ্কশায়িনী দেখিলে হৃদয়ে কি দুর্বিসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা পাঠক ! আপনি যদি কখন এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্যই আজ আমাদের নলিনীকান্ত সব সুখে সুখী হইয়াও এক শোকে এতদূর অধীর হইয়াছেন ; তাই আজ নিভৃতে বসিয়া, চিন্তা করিতেছেন ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

সহসা কাহার অস্ফুট শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সজনীকান্ত তাঁহাকে ডাকিতেছে।

সজনীকে দেখিয়া, তিনি স্বীয় মনোগত ভাব লুক্কাইত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু সজনীর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তাহা অগ্রেই দেখিতে পাইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "সজনী, তুমি এখনও নিদ্রা যাও নাই ?"

সজনী। না দাদা ! আপনার শরীর অসুস্থ শুনিয়া, এখন কেমন আছেন, একবার দেখিতে আসিলাম। আপনার শরীর কি বড়ই অসুস্থ ? হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কি ?

দাদা। হাঁ ভাই, আজ আমার শরীর বড়ই অসুস্থ। কেন যে হঠাৎ এরূপ হইল, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সজনী। আজ কি কিছুই আহার করিবেন না ?

দাদা। না ভাই, আজ আর কিছুই খাব না। রাত্রি অধিক হইয়াছে ; তুমি শয়ন করগে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বজনী। দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো ব'লে মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার শরীর এক্ষণে যেরূপ অসুস্থ দেখিতেছি, তাহাতে এখন বলিতে সাহস করি না।

দাদা। কি বল্‌বে, বল না?

স্বজনী। দাদা! আজ থাক, কাল্‌ যদি ভাল থাকেন ত বল্‌বো। রাত্রিও অনেক হয়েছে, আপনি শয়ন করুন।

পাঠক! আসুন, স্বজনীকান্ত তাহার শয়নকক্ষে কি করিতেছে, একবার দেখি।

পাঠক! বিস্মিত হইবেন না। এটি ইংরাজ সাহেবের ঘর নয়, কিম্বা এটি কোন ফিরিঙ্গি সাহেবের কামরাও নয়, এটি উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গবাবুদের প্রথামত ও আদেশমত সজ্জিত। এটি ইংরাজদিগের অনুকরণে সুসজ্জিত। আপনি হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের জাতীয় অনুকরণ ত্যাগ করিয়া কেন বিজাতীয় অনুকরণে ইহা সজ্জিত হইল? তাহার উত্তর এই, আজ কাল ইহারা দিবারাত্র অনুকরণ অনুকরণ লইয়াই ব্যস্ত। ইহারা কাহাদিগের অনুকরণ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুকরণকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহাই ইহাদিগের একমাত্র চিন্তা। কোন বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া, ইহা ভাল কি মন্দ, সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, ইহা দ্বারা দোষ আছে কি গুণ আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া, ইহাদ্বারা উন্নতি হইবে কি অবনতি হইবে, সে বিষয় চিন্তা না করিয়া, কেবল 'অনুকরণ কর' 'অনুকরণ কর' ইহাই ইহাদিগের একমাত্র চিন্তা — এক মাত্র ভাবনা। যে জাতিদিগের রীতি নীতি, যাহাদিগের আচার ব্যবহার, যাহাদিগের চাল চলন, যাহাদিগের বসন ভূষণ দেখিতে বাহিরে একটু সভ্য ভব্য, অমনি তাহারই অনুকরণ কার্য্যেই তৎপর। ইহার ভিতরে সার আছে কি অসার আছে, সে বিষয় ক্ষণকালের জন্য বিবেচনা না করিয়া, সেই জাতিদিগের সমতুল্য হইবার

নিমিত্ত সদাই তৎপর, সদাই ব্যস্ত। যদি তা না হবে, তাহা হইলে আজকাল নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কাপড় পরার পরিবর্ত্তে, হ্যাট কোট পেন্টুলন পরিধান করিয়া, হস্তদ্বারা খাদ্য সামগ্রী উত্তোলনের পরিবর্ত্তে, কাঁটা চাম্‌চে প্রয়োগ করিবেন কেন? এ জাতির আর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক, এই অনুকরণ করিবার ক্ষমতা টুকু খুব আছে। এ সম্প্রদায়ের লোকদিগের মুখে মুখে, ছত্রে ছত্রে ইংরাজী কথা। যাহার সহিত কথা কহেন, সে ইংরাজী বুঝুক বা নাই বুঝুক, জানুক বা নাই জানুক, তাহার নিকট স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য, আপনি একজন উচ্চদরের ইংরাজী ভাষাজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য, কি দাস দাসীদিগের নিকট কি ছোট ছোট ভাই ভগিনীর নিকট, কি অপর কোন অপরিচিত লোকের নিকট, যাহারা আদৌ ইংরাজী ভাষা বুঝিতে বা কহিতে পারে না, তাহাদিগের নিকট, প্রতি কথাতেই ইংরাজী কথা প্রয়োগ করেন। ইহার নাম কি বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়? ইহার নাম কি সভ্যতা? ইহাদিগের এরূপ সভ্যতাকে ধিক! এরূপ বিদ্যাবুদ্ধিকেও ধিক! ইহা কাহাদিগের অনুকরণ? কাহাদিগের নিকট হইতে এরূপ আচরণ শিক্ষা করিলে? কে তোমাদের এরূপ অনুকরণ কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য জন্য পরামর্শ দিলে? বিজাতীয়দিগের অনুকরণ কি এতই ভাল যে, সে অনুকরণ না করিলে আর সভ্য ভব্য বলিয়া পরিচিত হইবার অন্য উপায় নাই? তাই বলি পাঠক! আপনি বিস্মিত হইবেন না, কিম্বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না! সজনীকান্তের ঘরে কোথাও টেবিল চেয়ার, কোথাও ডিস্ চা দানি, কোথাও কাঁচের গেলাস, কোথাও কাঁটা চামচে, ছুরী, কোথাও হ্যাট, কোট, পেন্টুলন, কোথাও বিলাতী ছবি, কোথাও রাশি কৃত মদ সুসভ্য ইংরাজী অনুকরণে সুসজ্জিত দেখিয়া ইহাকে ইন্দ্রু, পিন্দ্রু সাহেব বলিয়া গালি দিবেন না। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য। এ সমুদায় ঊনবিংশ

শতাব্দীর সভ্যতার চরম ফল! ইহা আমাদের দোষ নহে; আমাদিগের অনুকরণের দোষ।

স্বজনীকান্ত দেখিতে কিট্ গৌরবর্ণ। গঠনখানি অতি সুন্দর। হস্তপদাদি সুডোল; নাসিকা প্রশস্ত; পদ্মপত্রের ন্যায় যুগ্মনেত্র, আকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ললাট উন্নত ও বিশাল বক্ষ। নাসিকার নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবীন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রোমাবলী অতি সুন্দর শোভা পাইতেছে। চুলগুলি বাউরীকাটা ও মধ্যস্থলে সিঁতি। চুলগুলি এরূপভাবে আঁচড়ান যে, সহসা দেখিলে বোধ হয়, নাগগণ ক্রোধান্ধ হইয়া স্ব স্ব ফণা ধারণ করতঃ যেন কুণ্ডলাকার ধারণ করিয়াছে। বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর।

স্বজনী ভ্রাতার শয়নকক্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, স্বীয় শয়নকক্ষে একখানি কৌচের উপর আসিয়া শয়ন করিলেন। স্বজনীর হৃদয়ে আজ সুখ নাই। স্বজনীর সুন্দর বদন আজ বিষাদের কালিমায় পরিপূর্ণ। স্বজনীর অন্তঃকরণে আজ বিষবীজের অঙ্কুর হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই ঊষা সমাগমে সুখী কে?

রজনী অবসানপ্রায়, পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ঊষা আগত। আহা, এই যে ঊষাদেবী আগমন করিতেছেন! ইহা দেখিয়া কতশত লোক যে সুখানুভব করিতেছে এবং কতশত লোক যে দুঃখ সাগরে ভাসমান তাহা সংখ্যা করা যায় না। ঊষা সমাগম দেখিয়া, প্রকৃতিসতী যেন হাস্যময়ী হইয়া উঠিতেছেন। তপনদেব স্বীয়

কিরণজাল বিতরণাশয়ে পূর্ব্বদিক্‌কে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিতেছেন।

এই উষাসমাগমে সুখী কে?

"পাঠক! ঐ দেখুন. ঐ যে লোকটি বসিয়া আছেন, উঁহার মুখ আজ কতদূর প্রসন্ন। ঐ দেখুন, উনি হস্তচালনা করিতেছেন আর আপন মনে কি বকিতেছেন। 'এত প্রত্যূষে আর কেহই এখনও শয্যা পরিত্যাগ করে নাই; কিন্তু ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ সকলের আগে উঠিয়াছেন, ইহার কারণ কি জানেন? উনি একজন কুসীদজীবি। উনি মনে মনে আপন প্রদত্ত অর্থের কত সুদ বৃদ্ধি হইল, তাহাই গণনা করিতেছেন, আর এক একবার মাথা নাড়িয়া কি মৎলব আঁটিতেছেন, আর আপন মনে হাস্য করিতেছেন। ঐ দেখুন, ঐ নবপরিণীত যুবকের আজ কত আমোদ, আজ তাহার বদনকমল কত আহ্লাদে পরিপূর্ণ। যুবক মনে মনে গণনা করিতেছে যে, তাহার প্রণয়িনী আব একদিনের বড় হইল। কিন্তু ভাবিতেছে না যে, তাহার মনোরমার জীবনের একদিন অতিবাহিত হইল। ঐ দেখুন, ঐ যুবকটির আজ কত আমোদ। যুবকের এতাদৃশ আহ্লাদের কারণ কি জানেন? ঐ যুবকের আজ বিবাহ। সে আজ তাহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী একজন প্রাপ্ত হইবে। যদিও এই পরিণয় কার্য্য পরিশেষে তাঁহাদের সুখের কিম্বা দুঃখের কারণ হয়, তথাপি অদ্য সে সুখী। আর ঐ কারাবাসী, তাহার যন্ত্রণার একদিন উপশম হইল ভাবিয়া সুখী হইতেছে। ঐ দেখুন, ঐ লোকটির মুখ আজ কতই প্রফুল্ল। উনি আজ প্রথম পুত্রমুখ সন্দর্শন করিলেন। এই উষাসমাগম দেখিয়া কুমুদিনী সতী আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন ও গা ফুলাইয়া হেলিতেছেন, ও দুলিতেছেন কেননা অচিরেই তিনি পতিমুখ সন্দর্শন করিতে পাইবেন। আর এই যে উষাসমাগম হইতেছে, এই উষা আগমনে কে কে অসুখী?

ঐ যে জরাজীর্ণ স্থবির, যে উঠিতে বা নড়িতে কষ্টানুভব করিতেছে, যাহার প্রাণধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র, উহার মুখে আজ বিষাদের

কালিমা পড়িয়াছে। উনি মনে করিতেছেন যে, আমার জীবনের এক দিন অবসান হইল। আর অসুখী কে? অসুখী কেবল কোন কোন বৃদ্ধ পিতা মাতা; কেননা, তাঁহাদের একমাত্র জীবনোপায় অমূল্য পুত্র আজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। আর অসুখী কে? অসুখী কেবল মৃতদার পুরুষ; কেন না, তাহার পত্নীশোক হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। আর অসুখী ঐ বিধবা রমণী; কেন না, তাহার স্বামীর গুণাগুণ মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। আর অসুখী কেবল ঐ সমুদায় দস্যু তস্করগণ; কেননা, তাহাদের ইপ্সিত কার্য্যে বাধা পড়িল। আর অসুখী কেবল ঐ দুরাচার লম্পটগণ; কেননা, তাহাদের বারবিলাসিনী-সহবাস-সুখ শেষ হইল। আর অসুখী কেবল আমাদিগের নলিনীকান্ত; কেন না, তাঁহার চিত্ত আজ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান, তাহাতে আবার সারারাত্রি জাগরণ।

বেলা ৮টা বাজিয়াছে। নলিনীকান্ত এখনও শয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বজনী ভ্রাতার অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া, আস্তে আস্তে ভ্রাতার শয়নকক্ষাভিমুখে গমন করিতেছে। যেমন সে শয়নকক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি কাহার অস্ফুট শব্দ তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। মনে মনে ভাবিল, হয় ত খুড়া মহাশয় দাদাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু খুড়ামহাশয়ের স্বর ত এরূপ নহে? যদি এরূপ হবে, তবে চুপে চুপে কথা কহিতেছেন কেন? তবে দাদা কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন? এ যে রমণীর কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতেছে। এ কি কোন মায়াবিনী দাদাকে ছলনা দ্বারা মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে? না, কোন স্বেচ্ছাচারিণী স্বীয় কামেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত্যাশয়ে দাদার নিকট রজনীতে আগমন করিয়াছিল, এক্ষণে পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছে? না, এ যে পরিচিত স্বর বলিয়া বোধ হইতেছে! যে হউক লোকটা কে, একবার দেখতে হচ্চে! এই বলিয়া পশ্চাৎ দিকের জানালার একটী খড়খড়ি

উদ্‌ঘাটন করিল। দেখিল যে, হেমপ্রভা দাদার সহিত কথোপকথনে নিযুক্তা, কৌতূহলপরবশ হইয়া শুনিতে লাগিল। সেই কথোপ-কথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

হেম। ও হে রসরাজ! অত রাগ কেন? "যতন না কর্‌লে কি রতন মেলে?"

নলিনী। আমার কি অযতন দেখ্‌লে?

হেম। রসমানিক! "ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পীরিত" এ কল্লে কি কাজ চলে! কত সোহাগ কর্‌তে হয়, কত আদর কর্‌তে হয়, কত যত্ন কর্‌তে হয়, কত ভাল বাস্‌তে হয়, কত মানভাঙতে হয়, তোতা পাখির মতন পড়াতে হয়, তবে ত পাখি পোষমানে?

নলিনী। হেম! আদর, যত্ন, সোহাগ, ভালবাসা দেখাতে কি কম করেছি? যাহাকে বাল্যকাল হইতে লেখা পড়া শিখাইয়াছি, যাহার সহিত চিরকাল অকপটে বাক্যালাপ করিয়াছি, যাহার গায়ে সামান্য মাত্র কণ্টক বিদ্ধ হইলে কত দূর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট ত গোপন নাই। তার মুখ দিয়ে কি একটা কথা বেরুল না? যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, যাহাকে শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে সদাসর্ব্বক্ষণ মানসচিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি আজ তার মুখ দিয়া কি একটা কথারও উত্তর পাইলাম না?

হেম। জানই ত, স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। তোমার মতন ত সে লজ্জার মাথা খেয়ে কথার উত্তর দিতে পারে না?

নলিনী। তুমি ত তোমার সয়ের দিকে টান্‌বেই?

হেম। সাধে কি বলি, পুরুষজাতি অতিনিষ্ঠুর! যদি অবলার সরল হৃদয়ে কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে অনুভব করতে পারত, তা হলে কি এতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে?

নলিনী। ওঃ! আমি নির্দ্দয়! আমি তাহাকে আমার জীবন, প্রাণ, হৃদয় সর্ব্বস্বই দিয়াছি, তথাপি আমি নির্দ্দয়!

হেম। সেত কবে তোমাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে? কবে তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে? সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তোমা ভিন্ন অন্য স্বামী গ্রহণ করিবে না। অন্য পুরুষকে পিতা, ভ্রাতা, পুত্র সদৃশ জ্ঞান করিবে। যদি তাহার পিতা, তাহার অমতে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে, এ পাপসংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরকৌমারী-ব্রতে নিযুক্ত থাকিবে। তাহার দোষ কি? সে অবলা, সরলা, ভয়বিহ্বলা, লজ্জাশীলা। তাহার প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখখানি দর্শন করলে তাহার অন্তঃকরণে কি কোন দ্বিভাব আছে বলিয়া বোধ হয়? যে ক্ষণকাল তোমায় না দেখ্‌লে দশদিক শূন্য দেখে সে কাল সারা-রাত্রি কি দুর্বিসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে, একবার ভাব দেখি?

নলিনী। আর আমিই বুঝি সুখে নিশি যাপন করিয়াছি?

হেম। না, তা বলছি না, তবে কি না, স্ত্রীলোক অবলা। কিসে কি হবে, কিছুই বুঝ্‌তে পারে না। হাজার হক দশহাত কাপড়েও স্ত্রীলোক উলঙ্গ। সে যদি না বুঝে একটা কাজ করে থাকে, তাহার জন্য সে কি ক্ষমার পাত্রী হইতে পারে না। আর দেখাসাক্ষাৎ হবে না, এ কে... দেশী পণ? আমার মাথা খাও, আমার মরামুখ দেখ, আজ... সময় সইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমার এ অনুরোধ...

নলিনী। কখনই পারবো না।

হেম। কেন?

নলিনী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ...

নিদর্শন পত্রে তাহার ভালবাসা ...

তোমার সয়ের সঙ্গে দেখা কর...

হেম। আজ যাবে না?

নলিনী। না।

হেম। যাবে না?

নলিনী। না।

হেম। যাবে না?

নলিনী। না।

হেম। দেখ, তিন সত্যকড়ার কর্‌লে, যদি যাও, তা হলে নরকে প'চে মর্‌বে।

নলিনী। আচ্ছা যদি যাই, তা হলে নরকে ডুবে মর্‌বো। না গেলে ত প'চবো না?

হেম। তবে আমি চল্লুম।

নলিনী। যাও।

হেমপ্রভা ঈষৎ রাগতভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিল। স্বজনী যে অগ্রেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহা আর পাঠকমহাশয়কে জ্ঞাত করাইবার আবশ্যক করে না।

স্বজনী হেমপ্রভার বিদায়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করতঃ নিচে সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইল। ইচ্ছা—হেমপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ। মুহূর্ত্তকাল পরেই হেমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যেন কিছুই ...নে না, বা শুনে নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হেম! ...বাবু কেমন আছেন দেখ্‌লে?

...নীর যে কোন অসুখ হইয়াছে, তাহা আদৌ হেম জানে ...গোপন করিয়া বলিল, এখন একটু ভাল আছেন।

...সময় যদি আর একবার দাদাবাবুকে দেখ্‌তে ...উপকৃত হই। আমার বিশেষ আবশ্যক।

... আসেন, তাহা হইলে নির্জ্জনে

...বা। যদি ...কাবাবুর অনুমতি

...ইলাম। এক্ষণে ...পনার

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পতি পত্নীর পরামর্শ।

রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা। রাস্তায় জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, মধ্যে মধ্যে এক একবার ঝিল্লিরব শোনা যাইতেছে। আকাশ পরিষ্কার। নৈশসমীরণ মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। শরীর স্নিগ্ধ ও শীতল।

অমরেন্দ্রবাবু আজ আহারান্তে শয়ন করিয়া এক অভিনব চিন্তায় নিযুক্ত। একজন চাকর আসিয়া, গাগরিয়া তামাকু সাজিয়া ও কতক-গুলি পান একটি তাম্বুল-করঙ্কে করিয়া, বাবুর নিকট রাখিয়া গেল। অমরেন্দ্রবাবু নলটী মুখে করিয়া, পার্শ্বস্থ তাম্বুলপেটিকা হইতে এক একটি লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে মুখ হইতে রাশিকৃত ধূম বাহির করিতে-ছেন। দেখিতে দেখিতে পার্শ্বস্থ তাম্বুলকরঙ্ক শূন্য হইয়া গেল। এমনই অন্যমনস্ক যে, পার্শ্বে শূন্যপাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতেই এক একবার হস্ত পরিচালনা করিতেছেন। চিন্তা কি মায়াবিনী! চিন্তায় মনুষ্যকে সময়ে সময়ে পাগল করিয়া ফেলে এবং কখনও বা স্বর্গের সোপান দেখাইয়া দেয়। যাহার শরীরে চিন্তা নাই, তাহার ন্যায় সুখী আর কে আছে? জগতে সকলেই চিন্তার প্রসাদ ভিক্ষুক। সুতরাং প্রকৃত সুখী জগতে অতি বিরল।

পাঠক মহাশয়! আপনি যদি কোন বিষয় কর্ম্মিষ্ঠ লোক হয়েন,— তাহা হইলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখভোগের আকর বলিয়া বিবেচনা করে, আপনি কি যথার্থই সেইরূপ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন? আপনি কি

কখনও চিন্তাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই? আপনি কি কখনও দুর্বিসহ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হয়েন নাই? আর আপনি যদি কোন ধনবান্ লোক হয়েন, বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখী বলিয়া বিবেচনা করে, আপনি কি যথার্থই সেইরূপ সুখী? উন্নতচেতা, উদারচরিত্র, স্বার্থশূন্য লোকেরা পরোপকার করিয়া যেমন বিমল সুখ সম্ভোগ করেন, আপনি কি ধন সঞ্চয় করিয়া, সেইরূপ নির্ম্মল সুখ উপভোগ করেন? যেমন সাধু পুরুষেরা আসন্নবিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র শঙ্কিত হন না! আপনি কি সামান্যমাত্র বিপদাশঙ্কায় চিন্তিত হন না? যদি না হন, তবে বলুন, আমরাও আপনাদের মতন হইতে চেষ্টা দেখি।

অমরেন্দ্রবাবু ধনশালী ও বিষয়ী লোক হইয়াও যখন এতদূর অন্যমনস্ক ও চিন্তিত, তখন জগতের কি ধনী, কি দুঃখী, কি রাজা, কি প্রজা সকলেই চিন্তার অধীন। চিন্তাশূন্য লোক জগতে কেহই নাই।

সহসা কাহার অলঙ্কারের ঝম ঝম্ শব্দে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দেখিতে দেখিতে অমরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণী মনোরমা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা এক হস্তে একখানি তালবৃন্ত ও অপর হস্তে কতকগুলি তাম্বুল লইয়া পতির পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। স্ত্রী, স্বামীসোহাগের নিমিত্ত সবই করিতে পারে। অসম্ভবকে সম্ভব, বা সম্ভবকে অসম্ভব করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ বলিয়া বোধ হয় না। অনেক পতিব্রতা স্ত্রী আছেন যে, স্বামী আহারে উপবেশন করিয়াছেন, আপনি একখানি তালবৃন্ত লইয়া স্বামীকে বীজন করিতেছেন। হয়ত গ্রীষ্মের লেশ মাত্র দেখা যাইতেছে না। শরীর বেস স্নিগ্ধ ও শীতল বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি পতিপরায়ণা স্ত্রী, স্বামীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে ছাড়িতেছেন না। আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিব। ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা আমরা বহন করিতে ইচ্ছুক। আমদের মনোরমাও এই ধরণের পতিসোহা-

গিনী। যদিও মৃদু মৃদু বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে, তথাপি মনো-রমা ব্যজন করিতে ছাড়িতেছেন না। হয় ত, কোন কোন পাঠিকা আমা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ আবার কোন্ দেশী ঢং? তাহার উত্তর এই, যে স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের প্রতি উচ্চদৃষ্টিতে চায় না, যে স্ত্রী পতির বিন্দুমাত্র কষ্ট দেখিলে, কি উপায় অবলম্বনে শীঘ্রই স্বামীর কষ্ট দূরীকরণ করা যায়, তাহার চিন্তায় অনুক্ষণ চিন্তিত, যে স্ত্রী স্বামীর সামান্য অনিষ্টোৎপাদন আশঙ্কায় সতত কাতর, যে স্ত্রী পতিই একমাত্র গতি ভাবিয়া মনে স্থান দেয়, যে স্ত্রীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই স্বর্গ, পতিই সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস, তাহারা পতির শরীরে বা মনে বিন্দুমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হউক বা না হউক, স্বামীর চিত্তরঞ্জনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। তাই আজ আমাদের মনোরমা তালবৃন্ত লইয়া অল্পে অল্পে ব্যজন করিতেছেন; কখনও বা স্বামীর পা টিপিতেছেন; কখন বা স্বামীর মুখাবলোকন করিতেছেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। অমরেন্দ্রবাবু স্ত্রীর নিকট একটি কথা বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন। বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না, ভয়,—পাছে প্রকাশ হয়। কখনও ভাবিতেছেন, স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি লঘু। স্ত্রীলোকের নিকট কোন কথাই গুপ্ত থাকে না। নিতান্ত গুহ্যকথা বলিলেও শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া যায়। কখনও ভাবি-তেছেন, যে স্ত্রী আত্মার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, তাহাকে আবার অবিশ্বাস কি? কখনও ভাবিতেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর সুখ দুঃখের অংশভাগিনী, ভালমন্দ বিচার করিবার একজন পরামর্শদাতৃ, তাহাকে অবিশ্বাস কি? যদি জগতের সকলকেই অবিশ্বাস করিয়া চলিবে, তবে বিশ্বাস করিবে কাহাকে? এরূপ করিলে আর জগৎ-সংসার চলে না। তাহা হইলে কেহ আর সংসারাশ্রমে থাকিতে পারে না। মনোরমা আমার সাধ্বী সতী পতি-পরায়ণা। ইহাকে যদি আমি অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমার ন্যায় ঘোর নারকী আর কে আছে? তাহা হইলে আমাকে

অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কখনও ভাবিতেছেন, যে কথা বল্‌বো হয় ত শুনে কত সুখী হবেন; কত আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌বেন! আবার ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন, "একটা কথা বল্‌বো?"

মনোরমা স্বামীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি বলিবে! বল না?"

অমরেন্দ্রবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। খানিক পরে বলিলেন, "না, কিছুই নয়।"

মনোরমার মন আরও উৎকণ্ঠিত হইল। সহসা স্বামীর মন এরূপ বিকৃতভাব হইল কেন? বুঝি হতভাগিনীর সেবাশুশ্রূষায় কোন ত্রুটী হইয়াছে; নতুবা এমন হবে কেন! পতিব্রতা রমণী সর্ব্বদাই স্বামীর সেবাশুশ্রূষা লইয়াই উতলা।

স্বামীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, মনোরমা স্বামীর চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, বল না গা। আমার কাছে বল্‌তে হানকি? আমার কি সে কথা শোনা দোষনীয়! না, সে কথা বল্‌তে অবিশ্বাস কর।"

অম। দেখ, মনোরমে! তোমায় যে দিন অবিশ্বাস করবো, সেই দিন যেন শত শত বৃশ্চিক আসিয়া আমায় দংশন করে, সে দিন যেন এ পাপ মুখ আর তোমায় দেখ্‌তে না হয়।

মনো। তোমার এমনই ভালবাসা বটে।

অম। একটি কথা বল্‌বো মনে কর্‌ছি, কিন্তু সে কথা শুনলে পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়, সেই জন্যই ইতস্ততঃ কর্‌ছি; নচেৎ অন্য কিছুই ভাব্‌ছি না।

মনো। তবু ভাল। আমার বোধ হচ্ছিল, তোমার শরীরে কোন অসুখ উপস্থিত হয়েছে। বালাই! ঈশ্বর করুন, যেন তাহা না হয়; কি বল্‌বে বল।

অম। কুসুমকুমারীর বিবাহের জন্য আমি একটী পাত্র স্থির করেছি। তাহার বিবাহের সময় হয়েছে। আর ত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না। কি বল? তোমার কি মত?"

মনোরমা স্বামীর মুখে কুসুমের বিবাহ প্রস্তাব শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। যে কথা বলিবার জন্য, তিনি নিজে মনে মনে কতবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আজি সহসা স্বামীর মুখ হইতে সেই কথা প্রকাশ হওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রটী কে?"

অম। পাত্রটী দেখতে শুনতে বেস, লেখা পড়াও খুব শিখেছে, ধন সম্পত্তিও খুব আছে, বয়সও খুব কম। এই গ্রামেই বাস। কিন্তু———

"কিন্তু" কথাটি শুনিবাই মনোরমার মন বিকৃত হইল। বলিলেন, সবই ত ভাল আবার "কিন্তু কি?"

অম। তাহার মা বাপ কেউ নাই। আবার———

মনোরমার এক "কিন্তু" কথা শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। "আবার" কথা শুনিবা মন আরও ক্ষুণ্ণ হইল। সমস্ত কথা না শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার" আবার কি?

অম। আগে সমস্ত কথা শোন, তার পর ভালমন্দ যা বোধ হয় তাই ক'রো। বল্‌ছিলুম কি, সবই ভাল, কেবল কুলমর্য্যাদা নাই। একমাত্র কন্যা তাহাকে অকুলীনে দান কর্‌বো?

মনোরমা, ভালমন্দ কিছুই বিচার না করিয়া বলিল, কেন নলিনীর সঙ্গে কুসুমের বিবাহ দাও না? নলিনী কুসুমকে ভাল বাসে, কুসুমও নলিনীকে ভাল বাসে। আমার ইচ্ছা যে, নলিনীর সঙ্গে কুসুমকুমারীর বিবাহ দিই। উভয়ে একসঙ্গে খেলা করে, একসঙ্গে পড়াশুনা করে,

একসঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়; দেখে, শরীরও জুড়ায়। উভয়েই একপ্রাণ ও একমন।

অম। আমিও তঁ ছাই তাই বল্‌তেছিলুম। তুমি যখন আপন মুখ দিয়েই সমস্ত কথা বল্‌লে, তোমার যখন মত, তখন আর আমার অমত হতে পারে কি? এখন, "শুভস্য শীঘ্রং" হলেই বাঁচি। নলিনী যে কুসুমকে ভাল বাসে, ও কুসুম যে নলিনীকে ভাল বাসে, তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি। এই দেখ, তাহার নিদর্শন। এই বলিয়া একখণ্ড পত্র মনোরমার হস্তে দিলেন।

মনোরমা পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন; এবং কুসুম যে উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অম। আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি!

মনো। কি কথা?

অম। একেবারে দুই জনের বিবাহ।

মনো। কার কার?

অম। কুসুমকুমারীর আর হেমপ্রভার।

মনো। হেমের পাত্রও কি স্থির করা হয়েছে?

অম। হাঁ, হেমের জন্য যে পাত্র ঠিক করেছি, যদিও দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, তথাপি সে নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী।

মনো। তা হউক, লেখাপড়া ত বেস শিখেছে? স্বভাব চরিত্র ত ভাল?

অম। হাঁ, সে সব বিষয়ে ভাল।

মনো। তা হলেই যথেষ্ট। বেটা ছেলে, লেখাপড়া বেস শিখেছে, দশটাকা রোজকার কর্‌বেই কর্‌বে, কি বল?

অম। তা বেস ভরসা আছে। এক্ষণে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ। যাহাতে এ শুভকার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তা'র চেষ্টা করা উচিত।

মনো। হেমের জন্য কোন্ পাত্রটী স্থির কর্‌লে ?

অম। পাত্রটী তোমার অবিদিত নাই।

মনো। তবে কে ?

অম। সুরেন্দ্রকে জান ?

মনো। কোন্ সুরেন্দ্র ?

অম। যে সুরেন্দ্র, প্রিয়নাথ বাবুর অন্নে লালিত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত ও তোমার নলিনীকান্তের সহচর, সেই সুরেন্দ্র।

মনো। আহা! সুরেনও বড় সৎছেলে! কেমন মিষ্ট কথা ও কেমন হাসি হাসি মুখ, কেমন সুন্দর চক্ষু, কি সুন্দর ভ্রূযুগল! কাহাকেও উচ্চ কথাটী কয় না। সর্ব্বদা মুখে হাসি লেগে রয়েছে। এমন পাত্র যদি হেমের অদৃষ্টে ঘটে, তা হলে, হেমের ন্যায় সুখী কে ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কে তুমি কারাবাসিনী ?

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড স্বীয় প্রখর জ্যোতিঃ বিকীরণ আশয়ে মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতেছেন। প্রখর রবিকিরণে সমস্ত জগৎ দগ্ধীভূত হইতেছে। বিহঙ্গমেরা রবিকরোত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখলাভাশয়ে কুঞ্জমধ্যে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছে। প্রান্তরমধ্যস্থ গাভীগণ আর দলবদ্ধ হইয়া চরিতে চাহিতেছে না। তাহারাও তপনদেবকে গালি দিয়া বৃক্ষের সুশীতল ছায়া অনুসন্ধান করিতেছে। পথিকেরা আর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের ছায়া জীবনের কি সুখদ! তাহা এতক্ষণে কেবল

পথিকেরাই বুঝিতে পারিয়াছে। এই সময়ে জল যে কিরূপ বহুমূল্য পদার্থ, তাহা তৃষাতুরেরাই কেবল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। মায়াবিনী মরীচিকা স্থানে স্থানে স্বীয় মায়াজাল বিকাশ করিয়া তৃষাতুর পথিকদিগকে কেবল বৃথা আশা প্রদান করিতেছে।

এই প্রখর রবিকিরণে স্বজনীকান্ত দ্রুতপাদবিক্ষেপে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে প্রান্তর পার হইতেছে কেন? তাহার অন্তঃকরণে নিশ্চয়ই কোন গূঢ়াভিসন্ধি আছে।

পাঠক! আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুন। দেখি, যুবক কাহার অনুসন্ধানে এতদূর ব্যস্ত, এবং তাহার মনোগত অভিপ্রায় কি।

প্রান্তরের অনতিদূরেই একটী ভয়ানক জঙ্গল। এরূপ জঙ্গলে যে মনুষ্যের আবাসস্থান আছে, এমত বোধ হয় না। তবে স্বজনী এই জঙ্গলাভিমুখে আগমন করিতেছে কেন? অবশ্যই মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি অপ্রশস্ত পথ। এই পথ দিয়া যে সচরাচর লোকজন যাতায়াত করে, এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। পথের দুই পার্শ্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। কাহার সাধ্য, সেই ভয়ানক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করে। প্রত্যুত এই জনশূন্য স্থানটি দস্যুতস্কর-দিগের গুপ্ত আবাস বলিয়া বোধ হয়।

স্বজনীকান্ত সেই জঙ্গলমধ্য দিয়া, একাকী গমন করিতেছে। মনে বিন্দুমাত্রও ভয়ের চিহ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে না। বরং, মুখখানির প্রতি অবলোকন করিলে, সমধিক প্রফুল্ল বলিয়াই বোধ হয়। জঙ্গলের অনতিদূরে স্তূপাকার ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে এ স্থানে যে কোন দুষ্ট লোকের গুপ্ত আবাসস্থান ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্বজনীকান্ত সেই ইষ্টকরাশি স্থানে আগমন করিল, এবং একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া দাঁড়াইল। প্রস্তর খণ্ডের নিচেই

অপরূপ সুড়ঙ্গ; সুড়ঙ্গের মধ্যে দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। নানা-বিধ বিলাসদ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত। বায়ু আগমনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। দিবাভাগে প্রচুর পরিমাণে আলোও গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সুড়ঙ্গ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে যাইবার জন্য কেবলমাত্র একটি অপ্রশস্ত পথ; বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত না থকিলে, কেহই এথান হইতে নির্গম হইতে পারে না।

স্বজনী, একে একে অনেকগুলি ঘর অতিক্রম করিল। পরে, কাহার অস্ফুট রোদনধ্বনি শ্রবণে হঠাৎ দাঁড়াইল।

এই দুর্গম স্থানে কে রোদন করিতেছে? এ যে স্ত্রীলোকের আর্ত্ত-নাদ বলিয়া বোধ হইতেছে। হয় ত, কোন অসহায়িনী রমণী, দুরাত্মা দস্যুদিগের করকবলে পতিত হইয়া এখানে আনীত হইয়াছে। নতুবা, কাহার সহধর্ম্মিণী, কিম্বা ভগিনী, নরাধম লম্পটদিগের ষড়চক্রে পতিত হইয়া, এই জনশূন্য ভয়াবহ জঙ্গলমধ্যস্থ অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছে। তবে কি দুরাচার স্বজনী, এই অসহায়া অবলা কামিনীর সতীত্বহরণাশয়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছে?

মানবের মানসিক ভাব অবগত হওয়া মানববুদ্ধির অসাধ্য। কাহার অন্তঃকরণে কি ভাব আছে, তাহা অবগত হওয়া অতি দুরূহ। যাহাকে তুমি অতি সৎ বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহার অন্তঃকরণে যে কি ভাব আছে, তাহা তুমি সম্যক্‌রূপে অবগত নহ। তুমি যাহার বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া প্রকৃত ভদ্রলোক বলিয়া বিবেচনা কর, হয় ত তাহার অন্তঃকরণ এতদূর ঘোর পাপে কলুষিত যে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে তাঁহার মুখাবলোকন করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। তাই বলি, মান-বের সাধ্য নাই, মানবের মন অবগত হওয়া। যে স্বজনীকান্তকে সক-লেই সৎবালক বলিয়া অবগত আছে, যাহাকে দেখিলে সকলেরই মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়, যাহার নির্ম্মল চরিত্রে এখনও কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই, তাহার অন্তঃকরণ কি এতদূর ঘোর পাপে কলুষিত? হয় ত

স্বজনীকান্ত কোন অসহায়া কুলকামিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই দুর্ভেদ্য স্থানে আগমন করিয়াছে! হয়ত কোন অনাথিনী পথভ্রমে এই পথ দিয়া চলিতে চলিতে দুরাত্মা দস্যুদিগের করকবলে পতিত হইযাছে শুনিয়া তাহার সতীত্বরক্ষার্থে এখানে আসিয়াছে! নয় ত কোন পতিপ্রাণা কুলকামিনী দুরাত্মা লম্পটকর্ত্তৃক এ স্থানে আনীত হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য এই জনমানবশূন্য বিজন স্থানে আগমন করিয়াছে।

স্বজনী স্বীয় হস্তস্থিত চাবিদ্বারা দ্বার উদ্ঘাটন করিল। এ ঘরের চাবি স্বজনী কোথায় পাইল? কই, স্বজনী ত কোন স্থানে চাবির অনুসন্ধান করে নাই? এ চাবি যে স্বজনী গৃহ হইতে আনিয়াছে। অবশ্যই স্বজনীর নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক পড়িয়াছে। স্বজনীর বিমল চরিত্র এক্ষণে ঘোর পাপে কলুষিত। অবশ্যই স্বজনী এই কুলকামিনীকে স্থানান্তরিত করিয়াছে!

স্বজনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহমধ্যস্থ রমণী বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। আহা! এ অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা রমণীর ঈদৃশ অবস্থা কে করিল!

স্বজনী, রমণীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। অনতিবিলম্বে এক বিকটাকার মনুষ্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঠক! এই লোকটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিব। এই অপরিচিত লোকটির অবয়ব অতি ভয়ানক। হঠাৎ এই লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নিতান্ত নির্ভীকের অন্তঃকরণেও শঙ্কার উদয় হয়। লোকটির রূপের পরিচয় আর কি দিব, গায়ে কালি মাখিলেও সহজে অনুমান করা যায় না। দেহখানি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া; প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ বুকের ছাতি; চক্ষু দুটি যেন কুমারের চাক; সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া

আছে; মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল; মধ্যস্থলে আবার সিঁতি; সমস্ত শরীর গেঁটে গেঁটে; নাসিকা খর্ব্ব, কপাল চাপা, কাণ ছোট, গাল পুরু, অধর অপেক্ষা ওষ্ঠ মোটা, ঘাড় বেঁটে, এবং ভ্রূযুগলে অল্প অল্প লোম আছে। ছেলেবেলায় ছেলেরা যে জুজুর ভয় করে, এ লোকটিও প্রকৃতপক্ষে সেই জুজু। শরীরে অসীম ক্ষমতা, গাত্রে স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাতেরও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; নামটী অতি সুন্দর, কেষ্ট। কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের সহিত আর কিছুতে মিলুক বা না মিলুক, বর্ণে ঠিক ঐক্য হইয়াছে।

কেষ্ট, এক হস্তে একখানি তালবৃন্ত ও অপর হস্তে এক ঘটী সুশীতল জল রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। স্বজনী, প্রাণপণ যত্নে রমণীর সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। কখনও বা সুশীতল বারি লইয়া রমণীর চক্ষে ও মুখে নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা তালবৃন্তখানি লইয়া আস্তে আস্তে ব্যজন করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর রমণীর একটু চেতনা হইল। রমণী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়াই আবার কাহাকে দেখিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন।

রমণীর মুহুর্মুহুঃ এরূপ হতচেতনা হইবার কারণ কি? স্বজনীকে দেখিয়া, এতদূর শঙ্কিত হইতেছেন কেন?

স্বজনী এই অবলা কুলরমণীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? নতুবা, কামিনী এতদূর ভীত হইবে কেন?

লাম্পট্য-দোষ কি ভয়ানক! রে দুরাত্মা লম্পটকুল! তোদের অসাধ্য অকার্য্য অস্পর্শ্য কিছুই নাই। তোরা কি অভাগিনী কুলকামিনীদিগকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া, তাহাদের অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগকে চিরকালের মত অকুলপাথারে ভাসাইয়া দিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিস্? একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছিস্ যে, অসহায়া কামিনী-দিগের এই অমূল্য সতীত্ব-রত্ন নষ্ট হইলে, তাহাদের মনে কি কষ্ট হয়? তাহাদের মনে কি যাতনা হয়? লোকালয়ে মুখ দেখাইতে কিরূপ

লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়? ক্ষণিক সুখভোগের নিমিত্ত কি ঘোর অধর্ম্ম করিতেছিস্, কি ভীষণ অত্যাচার করিতেছিস্, একবার কি ক্ষণকালের জন্যও ভাবিয়া দেখিস্ না? তোরা যে কামিনীরে কুলের বাহির করিয়া আনিয়াছিস্, সে যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে কি আর পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে কি আত্মীয়ের নিকট মুখ দেখাইতে পারে? আর যদি সে সধবা হয়, তাহা হইলে, পিতা মাতার দুই চক্ষের শূল এবং প্রিয় পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়, তাহা কি তোদের অবিদিত আছে? রে পামর! একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছিস্ যে, তাহাদের এই অস্থায়ী যৌবন নষ্ট হইলে, তাহাদিগের কি দুর্দ্দশা হয়। একবার কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিস্ যে, শেষদশা তাহাদিগকে কি কষ্টে অতিবাহিত করিতে হয়? হয়ত এক-মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি, অথবা কাহার আলয়ে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বীয় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে হয়। দুরাত্মা! একবার জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ্! তোদের এই ভীষণ অত্যাচারে দিন দিন কত শত কুলকামিনী সতীত্ব রত্ন নষ্ট করিতেছে। কত প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। তোদের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান থাকিতেও তোরা মূর্খ, চক্ষু থাকিতেও তোরা অন্ধ। তোরা যখন ধর্ম্মপত্নীকে উপেক্ষা করিয়া, কুলটাদিগের সহবাসসুখাভিলাষী, তোরা যখন নরকেরজ্বলন্ত অঙ্গারসদৃশ বিষবৃক্ষপানে আসক্ত, তোরা যখন পতি-প্রাণা সহধর্ম্মিণীদিগের মুখসুধাপানে বিরত থাকিয়া, কুলটাদিগের অধরের হলাহল পানেই উৎসুক, তোরা যখন সতীসাধ্বী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসীদিগের পদসেবা করিতে লালায়িত, তোরা যখন পতিব্রতা কামিনীর সহবাসসুখ উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে নয়ননীরে ভাসাইয়া, ভুজ-ঙ্গিনী কালসর্পিণী কুলটাদিগের ভুজলতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে তৎপর, তোরা যখন সুধাভ্রমে গরলপানে উদ্যোগী, তোরা যখন প্রেমপরায়ণা রমণীর অঙ্গস্পর্শ-সুখে সুশীতল হওয়া উপেক্ষা করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিবার জন্য ইচ্ছুক, তখন তোরা ঈশ্বরের সৃজিত মানব না পশু?

রে পামর! তোরা কি নিমেষের তরেও ভাবিয়া দেখিস্ না যে, যেমন তুই অন্য ভ্রষ্টা কামিনীর সহবাসসুখের নিমিত্ত লালায়িত, সেইরূপ যদি অপর কোন দুরাচার লম্পট তোদের সহধর্ম্মিণীকে কি তোদের ভগ্নিদিগকে এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে তোদের মনে কিরূপ কষ্ট হয়, কিরূপ যাতনা হয়, কিরূপ রাগ হয়, লোকালয়ে মুখ দেখাইতে কিরূপ লজ্জা বোধ হয়? একবার চিন্তা কর দেখি, তাহা হইলে কখনই তোরা আর এরূপ আচরণ শিক্ষা করবি না। তাই বলি, লম্পটকুল! এখনও সতর্ক হও! এখনও ধর্ম্মপথে বিচরণ কর! এখনও সময় আছে! আর আপনার চরিত্রকে দূষিত ও ঘৃণিত কর কেন? যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য অনুতাপ কর! তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর!

লেখনী! আর অগ্রসর হইও না; দুরাচার রজনীর আর অধিক পাপকীর্ত্তনে আবশ্যক করে না। তোমার অবিশ্রান্ত গতি রোধ কর; আর অধিক পাপভারবহনে সমর্থ হইবে না। নরাধম লম্পট রজনী-কান্ত, আরও কি ভয়ানক অত্যাচার করিবে, তাহা লিখিতে তুমি অসমর্থ!

লেখনী! তোমার গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? তুমি অগতির গতি, গ্রন্থকারদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি সম্ভবকে অসম্ভব করিতেছ, এবং অসম্ভবকেও সম্ভব করিতেছ। তোমায় ঈদৃশ ক্ষমতা কে প্রদান করিল? লেখনী! আমরা তোমার ক্রীতদাস, তুমিই আমাদের একমাত্র সহচর। তুমি যাহা যথার্থ বলিয়া জান, তাহা বর্ণনা করিতে ভীত হও কেন? যদি কেহ তোমার বিপক্ষে অগ্রধাবন করে, করুক; তুমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না। আমরা জানি, তুমি আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তোমার বিপক্ষে হস্তক্ষেপ করে, কাহার সাধ্য? সত্যকথা বর্ণন করিবে, তাহাতে আবার ভয় কি! জগতে একমাত্র সারবস্তু সত্যধর্ম্ম। তুমি সেই সত্যের দাস; সত্যের আশ্রয় লইয়া তুমি তোমার স্বকার্য্যে নিযুক্ত হও; কেহই তোমার বিপক্ষে হস্তক্ষেপ করিবে না।

পাপিষ্ঠ স্বজনী, এই সরলা পবিত্রান্তঃকরণা বালিকার সতীত্বরত্ন নষ্ট করিবার আশয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনেক দিন ধরিয়া কত কৌশল কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারে নাই। অনেক চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি দুষ্টলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া, এই অবলা কুলকামিনীকে কৌশলে স্থানান্তরিত করিয়াছে। কত প্রকার প্রলোভনবাক্যে আশ্বাসিত করিতেছে, কিন্তু সরলার সরলচিত্ত কিছুতেই ভুলিতেছে না।

পাঠক! এ অসহায়া রমণী অপর আর কেহই নহে। আপনার পরিচিত অমরেন্দ্রবাবুর একমাত্র নয়নতারা, নলিনীকান্তের হৃদয়সর্ব্বস্ব কুসুমকুমারী।

কুসুমের আর সে হতচেতনা নাই, আর সে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ এক্ষণে ভয়ে পরিপূর্ণ। মনে সদাই আতঙ্ক, পাছে দুরাচার স্বজনী, তাঁহার অমূল্য সতীত্বরত্ন বলপ্রকাশে নষ্ট করে।

স্বজনী। কুসুম! যৌবন চিরস্থায়ী নয়। স্ত্রীলোকের যৌবন ও জোয়ারের জল উভয়ই সমান। একবার আসে আর চলিয়া যায়। জোয়ারের জল বরং আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু নারীর যৌবন একবার বহিয়া গেলে, আর ফিরিয়া আসে না। তুমি রূপসী, সুন্দরী, পূর্ণযৌবনে তোমার সর্ব্বশরীর ঢল্ ঢল্। এই অস্থায়ী যৌবন কেন বৃথা নষ্ট কর? যৌবনে পতিসহবাস—পতিসঙ্গই পরম সুখ ও পরম আরাধ্য। তুমি কেন সে সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বীয় যৌবন বৃথা নষ্ট করিবে? তোমার এই দুর্লভ নারীজন্ম কেন বৃথা অতিবাহিত কর? আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। আমাকে পতীত্বে বরণ কর। আমি তোমাকে চিরকাল এই হৃদয়মন্দিরে অঙ্কিত করিয়া রাখিব; তোমার প্রতিমূর্ত্তি চিরকাল আমার মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। আমার কোন কষ্ট নাই, কোন দুঃখ নাই। কুসুম! তোমার চরণে ধরি, তোমায় মিনতি করি, তোমার এ অতৃপ্ত যৌবন বৃথা নষ্ট করিও না। কুসুম! আমার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইবে কি?

কুসুম। সজনী! তুমি জান, আমি এক নলিনীকান্ত ভিন্ন আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিই না। নলিনী ভিন্ন আর সকলকেই সন্তান-তুল্য জ্ঞান করি এবং চক্ষেও সেইরূপ দেখিয়া থাকি। তুমি তাহার কনিষ্ঠ। তোমার মুখে এরূপ অসদৃশ বাক্য শোভা পায় না। তুমি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। এখনও আমাকে ভগ্নি সম্বোধন করিয়া পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে বিচরণ কর। ভাল চাও ত এখনও আমাকে বাটীতে রাখিয়া আইস।

সজনী। সুন্দরি! এখনও আমার কথা রাখ, আমি এই দণ্ডেই তোমাকে তোমার পিতার আলয়ে রাখিয়া আসিতেছি। একটীমাত্র ভিক্ষা আছে, সেই ভিক্ষাদান করিলে আমি তোমার অভিলষিত বিষয় সমস্তই এই দণ্ডেই সম্পন্ন করিয়া দিই। তুমি স্বীকার কর যে, তোমার পিতার সম্মতি হইলে আমায় বিবাহ করিবে?

কুসুম। সূর্য্যের যদি পশ্চিমে উদয় সম্ভব হয়, সমুদ্রের জল যদি শুষ্ক হইয়া যায়, অগ্নির যদি দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়, খল যদি পবিত্র হয়, শৃগাল যদি সিংহশাবক বধ করিতে পারে, সুমেরু যদি ক্ষুদ্রজীবি পঙ্গুর লঙ্ঘনযোগ্য হয়, ব্রহ্মার যদি অনলে মরণ সম্ভব হয়, পৃথিবী যদি সহিষ্ণুতা গুণ ত্যাগ করে, তথাপি কুসুমের এ অমূল্য সতীত্বরত্ন নষ্ট হইবার নয়। এ দুর্লভ রত্ন চিরকাল অটুট থাকিবে। যদি তুমি আমাকে সহস্র যন্ত্রণা দাও, যদি তুমি আমায় যাবজ্জীবন গুরুতর কষ্ট প্রদান কর, যদি তুমি আমার আপাদমস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করতঃ লবণ সংযুক্ত কর, যদি প্রজ্বলিত হুতাশনে এ শরীর দগ্ধ কর, তথাপি এ সতীত্বরত্ন নষ্ট হইবে না। এ জীবনে এক নলিনীকান্ত ভিন্ন আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিব না। "এ শরীর দেবগ্রাহ্য। যজ্ঞীয় হবিঃ কখনও শৃগালকুক্কুরের ভক্ষ্য হয় না; ঘোর নারকী কখনও স্বর্গীয় নন্দনকাননে স্থান পায় না?" তুমি আমার আশা ত্যাগ কর। আমা অপেক্ষা কত শত সুন্দরী রমণী তোমায় উপভোগ্যা হইবে।

এখনও আমাকে বাটীতে রাখিযা আইস। এখনও পাপপথ হইতে বিদূরিত হইয়া ধর্ম্মপথাবলম্বন কর।

স্বজনীকান্ত দেখিল যে, কুসুমকুমারীর মন কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়। এক্ষণে বল প্রকাশ বা অত্যাচার করিলে যদি কুসুম আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে না, তাহাকে চিরকালের মত দগ্ধ হইতে হইবে। স্বজনীকান্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যখন কুসুমকুমারী আমার করকবলে পতিত হইযাছে, তখন আজিই হউক বা দুই দিন পরেই হউক বা দুইমাস পরেই হউক, এক সমযে আমার বশীভূত হইতে হইবে। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার যৌবনে পদার্পণ করিযাছে, কত দিন আর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিযা থাকিবে? অবশ্যই এক সমযে আমার আশা সুসিদ্ধ হইবে। এই ভাবিযা, হস্তস্থিত চাবি দ্বারা পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিযা চলিযা গেল।

কুসুমকুমারীর যখন যাহা আবশ্যক হয, কেষ্ট অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করে। অভাগিনী পলাযনের জন্য কত চেষ্টা কত উদ্যম করিল, কিন্তু কিছুতেই কেষ্টর ভীষণ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। প্রত্যহই কেষ্টর নিকট কত কাকুতি মিনতি করে, আত্মকাহিনী বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু কিছুতেই কেষ্টর পাষাণ হৃদয়ে অণুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না। কুসুমকুমারী যখন চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইযা পড়েন, তখন মনে মনে এক একবার গালি দেন যে, "এ হতভাগা কেষ্ট কবে কেষ্ট পাবে? এত লোকের মরণ হয়, এ বেটার কি মরণ নাই?" হা বিধাতঃ। অভাগিনীর অদৃষ্টে কি সুখ লেখ নাই? অভাগিনীকে চিরকাল কি এই অন্ধকারময় কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সৃজন করিয়াছিলে?

নবম পরিচ্ছেদ।

—————*—————

প্রতিজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকরমন।

অমরেন্দ্র বাবুর একটি শয়নকক্ষে বসিয়া হেমপ্রভা ও সুরেন্দ্র কি কথোপকথন করিতেছে? সুরেন্দ্রের মুখে আর সে হাস্যভাব নাই; রসনায় সে ঠাট্টা-তামাসা নাই; অন্তঃকরণে আর সে পূর্ব্বকার মত প্রফুল্লতা নাই; তাহার মুখে এক্ষণে বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে। সুরেন্দ্র আজ এরূপ বিমর্ষভাবে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে? পাঠক! আসুন, আমরা উহাদের কি কথোপকথন হইতেছে শ্রবণ করি।

সুরেন্দ্র। "তাই ত কুসুমকুমারী কোথায় গেল! চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কামিনী সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া একাকিনী কোথায় চলিয়া গেল! কুসুমের অন্তঃকরণে এমন কি দুর্দ্ধর্ষভাবের উদয় হইয়াছে যে, তাহার পরিচালনায় বা তাড়নায় সে নির্ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া গেল!" হেম! কুসুমের গৃহত্যাগের কারণ কি কিছু জান?

হেম। আমার বোধ হয়, নলিনীবাবু সইকে হতাশ্বাস করিয়াছেন। সে দিন সই একখানি চিঠি লিখিয়া আমায় দেয়; সেই চিঠিখানা যে কোথায় হারালুম, তা আর খুঁজে পেলুম না। পরে সে চিঠিখানা খুড়ামহাশয় খিড়কীর বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, জান্‌তে পাল্লুম। আমারই অসাবধানতাবশতঃ এরূপ ঘটেছে। আমিই সইয়ের গৃহত্যাগের একমাত্র কারণ। আমার মাথা না খেয়ে সে দিন যদি সেই চিঠিখানা না হারাতুম, তা হ'লে সই কখনই গৃহত্যাগ করত না। তা হ'লে সইকে আর জন্মের মত হারাতুম না!

সুরেন্দ্র। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কুসুম কি নলিনীকান্তের সঙ্গে দেখা করেছিল?

হেম। হাঁ, করেছিল।

সুরেন্দ্র। তুমি তা'র সঙ্গে ছিলে? না, সে একলা গিয়েছিল?

হেম। না, সে একলা যায় নাই। তা'র অসহ্য কষ্ট দেখে আমি আর স্থির থাক্‌তে পাল্লুম না। তা'র আহারে স্পৃহা নাই, শয়নে বাসনা নাই, বসনভূষণে তাদৃশ যত্ন নাই, সদাই চিন্তা, সদাই অন্যমনস্ক, সদাই অশ্রুবিসর্জ্জন; এরূপ দেখ্‌লে কা'র হৃদয় আর স্থির থাক্‌তে পারে? বিশেষতঃ সই বাল্যকালাবধি আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্য করে, তা'র ঈদৃশ কষ্ট দেখে কি আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি? সুতরাং এক দিন বৈকালে সইকে সঙ্গে করে নলিনীবাবুদের বাড়ীতে যাই।

সুরেন্দ্র। তার পর———

হেম। সই ও আমি নলিনীবাবুর ঘরে গেলে, নলিনীবাবুর মাসী-মা আমায় ডাক্‌লেন। নলিনীবাবুর মাসী-মা সইএর সঙ্গে নলিনীবাবুর বিয়ের কথা তুল্‌লেন। উভয়েই উভয়কে প্রাণ ভ'রে ভালবাসে, তা'র অনেক নিদর্শনও দেখালেন। কথাবার্ত্তায় রাত হ'য়ে গেল। তা'র পর কি হ'ল কিছুই জানি না।

সুরেন্দ্র। তুমি আস্‌বার সময় কুসুমকে দেখ্‌তে পেলে না?

হেম। আমি আস্‌বার পূর্ব্বে নলিনীবাবুর ঘরে কাহাকেও দেখ্‌তে পেলুম না। মনে ভাবলুম যে, হয় ত নলিনীবাবু নিজে সইকে রাখ্‌তে এসেছেন। নচেৎ সই আমার কখনই একলা আস্‌তে পার্‌বেনা।

সুরেন্দ্র। তুমি কেন আস্‌বার সময় ভাল করে খোঁজ কর নাই?

হেম। আমার বুদ্ধিতে যতটুকু সম্ভব, তা'ই করেছিলুম। একবার মনে হ'ল, সইএর মন আজ আশ্বস্ত, হৃদয় শান্ত, আশালতা মুকুলিত হ'য়েছে। তাই আজ অহ্লাদে আমায় ডাক্‌তে ভুলে গিয়েছে। আবার মনে হ'ল, যদি নলিনীবাবু সইকে রেখে আসে, আমি কা'র সঙ্গে যা'ব, এটা কি সয়ের মনে হ'ল না? আমার মনে সন্দেহ হ'ল। আমি নলিনীবাবুর মাসী-মাকে সে কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম। তিনি

আমায় বুঝিয়ে বাটীর চাকর চাকরাণীদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, কিন্তু কেউই ঠিক কথা বল্‌তে পাল্লে না। একজন বুড় চাকর বল্লে, বড়বাবু ও একটী স্ত্রীলোক এই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। আমি দেখলুম, সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের বাটী আসতে হয়। মন কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থির হ'ল। আমি একজন দাসীর সঙ্গে বাড়ীতে ফিরে এলুম। বাটীতে এসে আগেই সইয়ের ঘরে গিয়ে দেখি, ঘর শূন্য। মনে ভাবলুম, হয় ত সই নলিনীবাবুর সঙ্গে খিড়্‌কির বাগানে বেড়াচ্ছে। এই ভেবে খিড়্‌কির বাগানে অনেক খোঁজ কল্লুম; কিন্তু কোথাও কাহারও দেখা পেলুম না। ক্রমশই সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পাল্লুম না। একেবারে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গিন্নার নিকট সব কথা খুলে বল্লুম। কর্ত্তাঠাকুরাণী একেবারে বাকশক্তিহীনা। শীঘ্রই অমরেন্দ্রবাবুর নিকট খবর গেল। অমরেন্দ্রবাবুও শোকে একান্ত আকুল হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠালেন। কোথাও সইয়ের অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। হায়! হায়। অভাগিনী হেমপ্রভা হইতেই এতাদৃশ সংঘটন হইল। আমি হতভাগিনী যদি সে দিন সইকে সঙ্গে লইয়া না যাই, তা হ'লে সই আমার কখনই অকালে মারা যেত না। এই বলিয়া হেমপ্রভা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্র। হেম। এতদূর অমঙ্গল আশঙ্কা ক'র না। তোমার সই কখনই প্রাণবিসর্জ্জন করেনি। আর এক্ষণে বৃথা রোদনে কোন ফল নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, কোন দুষ্টলোক কর্ত্তৃক কুসুম স্থানান্তরিত হয়েছে।

হেম। আমার বোধ হয় তা নয়। কারণ সইয়ের এমন আতশত্রু কে আছে যে, সেই অবলা সরলা বালার অন্তঃকরণে বেদনা দেয়? সই আমার প্রাণান্তেও কা'র অনিষ্ট করেনি। সকলকেই সমান আদর, সমান স্নেহ, সমান ভাল বাসে। সইয়ের মতন রমণী পৃথি

বীতে অতি বিরল। এরূপ অশেষগুণালঙ্কৃতা রমণীর উপর কেহ কি অত্যাচার ক'র্‌তে পারে? ইহাও কি সম্ভবপর যে, এতাদৃশ গুণবতী কামিনীর উপর কেহ কি বলপ্রকাশ করিতে পারে? যদি তা সম্ভব হয়, তা হ'লে এ পৃথিবীতে যেন আর কেউ জন্মগ্রহণ না করে।

স্বরেন্দ্র। তুমি নিতান্ত সরলহৃদয়া। তোমার মতন মন যদি সকলের হ'ত, তা হ'লে এই পৃথিবী স্বর্গভূমি হ'ত। তুমি জগতে কে কিরূপ লোক, তা জান না; সেই জন্যই এই কথা ব'ল্লে। তুমি যদি জান্‌তে যে, এ পৃথিবী কেবল পাপে পরিপূর্ণ, জগতস্থ প্রায় সমুদায় লোকই পাপের অনুচর, সকলেই পাপের আজ্ঞাকারী, সকলেই পাপের দাস, তা হ'লে এরূপ কথা কখনই তোমার মুখ হ'তে বেরুত না।

হেম। আমি জানি, সই আমার বড় অভিমানিনী। হয় ত নলিন বাবু সইকে উপেক্ষা করিয়াছেন। হয় ত অপর কোন সুন্দরী কামিনীকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। সই তা প্রকারান্তরে জানতে পেরেছে; সেই জন্যই হয় ত আত্মবিসর্জ্জন করেছে। যা'র আশা ভরসা সমুদায় ফুরুল, যাহাকে অসহ্য কষ্ট ভোগ ক'র্‌বার জন্য প্রাণ ধারণ করতে হ'ল, যা'র শরীর অহোরাত্র সপত্নীরূপ সুতীক্ষ্ণ-কন্টক দ্বারা বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, যা'র মনের ভিতর প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখা জল্‌তে লাগ্‌ল, সে আবার মরণে ভীত হ'বে? সই আমার নিশ্চয় হয় জলে, না হয় অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করেছে। হায়! আমি কি অভাগিনী! শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। এ সংসারে থাকিয়া পিতামাতার স্নেহ পাইয়াছিলাম, সহোদরার ন্যায় ভালবাসা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি এমনি মন্দভাগিনী যে, আমার অদৃষ্টে সে সুখ সহ্য হবে কেন? আমা হ'তেই খুল্লতাত মহাশয় দুর্লভ কন্যারত্নে বঞ্চিত হ'লেন।

স্বরেন্দ্র। দেখ হেম, আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার কোমল মনে ব্যথা দেখ্‌তে পারি না। আমি তোমার মস্তক স্পর্শ

করে শপথ করতেছি যে, তোমার সইকে অনুসন্ধান করে তোমায় প্রত্যর্পণ ক'র্‌ব। নচেৎ, তোমার সঙ্গে আর আমার ইহজন্মে সাক্ষাৎ হ'বে না। যদি কখন সফল হ'তে পারি, পুনরায় সাক্ষাৎ ক'রব, নচেৎ এই শেষ দেখা।

হেম। ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন। অবশ্যই তোমার চেষ্টা সফল হ'বে। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সেই ভূতভাবন বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম দিবানিশি জপ করিয়া থাকি, যদি আমি সেই বিপদতারণ ভগবানকে ভাবিয়া ভবের ভয় দূর করিয়া থাকি, যদি আমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া থাকি, যদি আমি সেই দয়াময় হরির চরণ সার ভাবিয়া থাকি, তবে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ধর্ম্ম তোমার সহায় হ'বে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হ'য়ে তুমি এই সদনুষ্ঠানে বহির্গত হও, কেহই তোমার অনিষ্টাচরণ করতে সমর্থ হ'বে না।

সুরেন্দ্র। হেম! অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লে আমার আশা পূর্ণ হবে কি?

হেম। সুরেন্! তোমার ন্যায় সন্দিগ্ধ-পুরুষ আর আমি কুত্রাপি দেখতে পাই না। তুমি কি এখনও আমায় অবিশ্বাস কর? যদ্যপি এ হৃদয় চিরে দেখাবার হ'ত তা হ'লে দেখাতুম যে, এ হৃদয়ে এক তোমা ভিন্ন আর কারও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত নাই। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক বা নাই হ'ক্, আমি তোমারই। যে দিবস প্রথম তোমার ঐ মোহন প্রতিমা আমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছে, সেই দিবস আমি আমার মন হারাইয়াছি, প্রাণ হারাইয়াছি, আমাতে আর আমি নাই। আমি এক্ষণে তোমারই আশ্রিত। আমি বাল্যকালাবধি কাহারও নিকট অকপটে মনের কথা কহিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমাকে পাইয়া আমার সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। ইচ্ছা হয়, চরণে রাখিও, নচেৎ চিরকাল অভাগিনীর এই এক দশায় অতিবাহিত হইবে।

সুরেন্দ্র। হেম! যখন আজ আপন মুখে সমুদায় কথা বল্লে তখন আমিও ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে শপথ কচ্চি, যদি বিবাহ করি, তা হ'লে তোমাকেই কর্‌ব। অন্য কামিনী আর এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। যে দিবস অন্য কামিনীতে এ মন আসক্ত হবে, সেই দিন যেন সহস্র বজ্র আমার মাথায় পড়ে। আর যেন আমায় তোমার ও-নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রিমা না দেখ্‌তে হয়।

হেম। পতিই নারীর পরম গুরু। বিপদে ও সম্পদে পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র ভরসা। স্ত্রী যদ্যপি পতিপরায়ণা হইয়া পতিসেবা করে, তা হ'লে নারীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। তা'কে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয় না। স্ত্রীলোকের পতিই এক মাত্র গতি। আমি পরোপকারার্থে তোমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ কচ্চি। আমি কায়মনো বাক্যে তোমার মঙ্গল কামনা ক'রব। পতিতপাবন ভগবান্ তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, হেমপ্রভার হৃদয়ে যে প্রবল বাত্যা বহিতে লাগিল, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে দাবানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, মর্ম্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে দুর্ব্বিসহ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা সে কাহাকে বলিবে? সেই শারদ-শশাঙ্ক-সদৃশ সোণার মুখ খানি আজ বিষাদের কালিমায় পরিপূর্ণ। বালিকার হৃদয়মধ্যে যে কত ঝড়ই বহিতেছে, কত আগুনই জ্বলিতেছে, কত দুর্ব্বিসহ চিন্তা আসিয়া যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, তাহা কাহার নিকট বর্ণনা করিয়া মনের আক্ষেপ দূর করিবে? তাহার একমাত্র আশালতা আজ সইয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত।, তাই আজ অসহায়িনী নীরবে অন্তর্জ্বালা সহিতেছে, আর ভাবিতেছে, আমি কি হতভাগিনী! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণসমা-প্রিয়-ভগিনী কুসুমকুমারী নিরুদ্দেশ, প্রিয়তম পতি তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত। ক্ষণকাল দুঃখের কথা কহিয়া মনের জ্বালা জুড়াই, এ অভাগিনীর এমন কেহ নাই। আমি যদি মাথা খাইয়া সুরেনকে

একাকী যাইতে না দিই, তাহা হইলে স্থরেন কখনই অন্বেষণে বহির্গত হইত না। আমিও কেন তাঁহার অনুগামিনী হইলাম না? বিপদে ধৈর্য্যের ন্যায়, রোগে ঔষধের ন্যায়, ভয়ে ভরসার ন্যায়, অন্ধকারে আলোকের ন্যায়, যন্ত্রণায় উপশমের ন্যায, অশান্তির শান্তির ন্যায, শরীরে প্রাণের ন্যায, কাযার ছাযার ন্যায, কেন তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলাম না? ওঃ! যদি তাই হবে, তাহা হইলে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভোগ কে করিবে? আমি হতভাগিনী কেবল দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিযাছি। এক্ষণে আর বৃথা অনুতাপে ফল কি? আমার ন্যায স্বার্থপর রমণী ত আর কেহই নাই, আমি স্বীয ঐহিক সুখভোগের নিমিত্ত প্রাণসমা প্রিযতমা, সহোদরা-সদৃশ-ভগিনীর অনুসন্ধানে বাধা দিতে প্রস্তুত? পুস্তকে পাঠ করিযাছি ও পুরাণে শুনিযাছি যে, পরোপকার মহা-ধর্ম্ম। পরোপকারার্থে কত শত লোক প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে! সুরেন্দ্র আমার মহদনুষ্ঠানে বহির্গত হইযাছেন. হে অনাদিদেব! ভূত-ভাবন ভগবান্! যদি আমি কাযমনোবাক্যে তোমার পূজা করিয়া থাকি, যদি আমি সাধ্বী সতী হই, আমার প্রার্থনা যেন অগ্রাহ্য না হয। আমার প্রাণকান্তে রক্ষা করিও। আমার প্রাণনাথের যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তোমার নিষ্কলঙ্ক নাম যেন কলঙ্কিত না হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীর অভিশাপ।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কত শত লোক প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাসপাত করিয়াছে, আবার কত শত লোক আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়াছে ;—কতশত লোক প্রাণাধিক পুত্র কন্যা রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে, আবার কত শত লোক এই অমূল্য দুর্লভ রত্ন লাভ করিয়াছে ,—কত শত লোক পত্নীরত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে, আবার কত শত লোক গৃহিনী শূন্য হইয়াছে ;—কত শত লোক পরস্ব অপহরণ করিয়া ধনবান হইয়াছে, আবার কত শত লোক যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া পথের কাঙ্গালী হইয়াছে ;—কত শত লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, আবার কত শত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে যত কিছু ভাল মন্দ, যত কিছু ধর্ম্ম অধর্ম্ম, যত কিছু হিত অহিত যত কিছু লাভ লোক্সান, যত কিছু সমস্তই হইয়া গিয়াছে।

সুন্দর নীলাকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রদেবের সুশীতল কিরণ থব্ থব্ থব্ থব্ করিয়া কাঁপিতেছে। সুধাংশুকিরণ কোথাও বা বৃক্ষ শাখায় ব্যবধান দিয়া স্রোতস্বতী কল্লোলিনী গোমতী নদীর সুশীতল সুবিমল সলিলে পতিত হইয়া কাঁপিতেছে, কোথাও বা গোমতী নদীতীরস্থ গৃহের বাতায়ন মধ্য দিয়া নিদ্রাভিভূতা যুবতীর বদন-কমল নিরীক্ষণ করিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। ইচ্ছা, তাহার বদনসুধা পান করেন। কোন কোন নিদ্রিতা যুবতীর বদনে চন্দ্র-কিরণ পতিত হওয়ায় চন্দ্রদেবের যেন কতই আমোদ, কতই তৃপ্তি। আকাশেও চাঁদ ;—গোমতী নদীরস্বচ্ছ সলিলেও চাঁদ। ইহা দেখিয়া কে

বোধ হইতেছে? চন্দ্রদেব যেন সন্ধ্যা সমাগমে নটবরবেশে স্রোতস্বতী সলিলরূপ দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন। চন্দ্রদেবের এক্ষণে বদন-শোভাই বা কত! দিবাভাগের চাঁদ ও রাত্রিকালীন চাঁদ যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। কারণ, দিবাভাগের চাঁদের জ্যোতিঃ নাই, সুশীতল কিরণ নাই, বাহার নাই, কিছুই নাই। নিশাসমাগমে সেই অস্পষ্ট জ্যোতির এক্ষণে বাহারই বা কত! সৌন্দর্য্য বা কত! আহা! এই যে ইতস্ততঃ চন্দ্রদেবের কিরণমালা ছড়াইয়া রহিয়াছে, ইহা কি? ইহা কি চন্দ্রদেবের মুখ-ভরা হাসি? অন্ধকার পাইলে যেমন লম্পটদিগের আহ্লাদের সীমা থাকে না, আমাদের চন্দ্রদেবও আজ অন্ধকার পাইয়া বড়ই খুসী! তাই আজ এত হাসি। চন্দ্রদেবের এই সুধাময়ী কৌমুদী দেখিয়া, তন্দ্রাভিভূতা কোকিলেরা দিবাভ্রমে এক একবার কুহু কুহু রব করিতেছে। চন্দ্রদেবের উদয়ে গগনস্থ নক্ষত্ররাজীর আর সে সৌন্দর্য্য নাই, আর সে উজ্জ্বলতা নাই, সে সুশীতল কিরণ নাই। চন্দ্রদেবের উদয়ে সমস্তই যেন হতশ্রী ধারণ করিয়াছে।

কুসুমকুমারীর অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুরেন্দ্রও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। আর পাষণ্ড সজনী কি করিতেছে? পাঠক আসুন, একবার সজনীকান্তের কার্য্যকলাপ অবলোকন করি।

সজনীকান্ত স্বীয় বৈঠকখানায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে ও আপন মনে কি বকিতেছে। কখন বলিতেছে যে, আহা! দরিদ্রতা কি বিষময় পদার্থ। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যু শত সহস্র গুণে প্রার্থনীয়। আহা! দরিদ্রেরা কি কষ্টেই দিন অতিবাহিত করে! যাহার বিভব নাই, যাহার সম্পদ নাই, যাহার অর্থ নাই, যে পথের কাঙ্গালী, যে একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, যাহারা মলিন বেশে, রুক্ষ কেশে, বিষণ্ণ বদনে, ক্ষুব্ধচিত্তে দিবানিশি অন্ন বিনা হাহাকার করে, যে ক্ষুধার জ্বালায় শূন্য উদরে পরের মুখাবলোকন করিয়া থাকে,

তাহার জীবিতাবস্থাই মৃত্যু, আর মৃতাবস্থাই শান্তি ও সুখভোগ। যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহার এ সংসারে সহায় নাই, আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, পথ নাই, উপায় নাই, সুখ নাই, বিশ্রাম নাই, কিছুই নাই। দরিদ্র হইলে নিজের পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলই পর হইয়া যায়। যে দরিদ্র, তাহার সহস্রগুণ বর্ত্তমান থাকিলেও সকলের নিকট অপরিচিত, অসীম সাহস থাকিলেও সকলের অপেক্ষা ভীত। তাহার আশা থকিলেও সে আশা সফল করিতে পারে না। তাহার মনে সাধ থাকিলেও সে সাধ মিটাইতে পারে না, তাহার সহস্র সাহস থাকিলেও নির্ভীক হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহার পক্ষে বিশ্ব বোধাতীত বস্তুস্বরূপ, জগৎ তাহার পক্ষে অনাবিষ্কৃত দেশ, পৃথিবী তাহার পক্ষে অরণ্য সদৃশ, সংসার তাহার পক্ষে মরুভূমি তুল্য, সমাজ তাহার পক্ষে শ্মশান, স্বদেশ তাহার পক্ষে কণ্টক স্বরূপ, বাসগৃহ তাহার পক্ষে অগ্নিকুণ্ড বলিয়া অনুমিত হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহার হস্ত থাকিতেও সে অকর্ম্মণ্য, পা থাকিতেও সে চলৎশক্তি-হীন, চক্ষু থাকিতেও সে অন্ধ, জ্ঞান থাকিতেও বোবা। তাহার পক্ষে সুখ দুঃখ সবই সমান। হায়! আমাকে কি এই অসহ্য দারিদ্রতা-দুঃখ অনুভব করতে হবে? আমি কি সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হ'তে পারব না? কেন পারব না? চেষ্টা কল্লে কি না সফল হয়? চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চেষ্টা কল্লে কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে? খুল্লতাত মহাশয়ের সমুদায় অংশ তাহার অজ্ঞাতসারে উইল করিয়া লইয়াছি, বাকি কেবল দাদার অংশ! দাদার অংশ কিরূপে লাভ করা যায়? বিষয় ত কম নয়, প্রায় লক্ষাধিক টাকা বার্ষিক আয়। ইহার অর্দ্ধেকাংশ ত খুল্লতাত মহাশয়ের। সে অংশ তৎহস্তগত হইয়াছে। অপরার্দ্ধ অংশ আমাদিগের দুই ভায়ের। প্রত্যেক ভাগের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ হাজার টাকা। দু-দশ টাকা নয়, দু-শ এক-শ টাকাও নয়, পাঁচিশ চশ হাজার টাকা। এত টাকার লোভ কি

সম্বরণ করা যায়? দাদার অংশ ত ফাঁকি দেওয়া চাই? একটা মতলব স্থির কত্তে হচ্চে।

স্বজনী গাত্রোত্থান করিল। স্বজনী কর কি! কর কি স্বজনী! ওকি! কি পান করিতেছ? বোতলের মধ্যে এমন কি সুস্বাদু পেয় আছে, যে তাহা পান করিবার নিমিত্ত এতদূর ব্যস্ত? স্বজনী! বোতল মধ্যে যদি কোন সুস্বাদু পেয় থাকে, তবে পান করিবার সময় বিকৃত মুখভঙ্গিমা কর্‌লে কেন? বোতল মধ্যস্থ তরল দ্রব্যের সৌগন্ধে ঘর যে আমোদিত হয়েছে? ভাই স্বজনী! তোমার মস্তক ঘূর্ণিত হ'চ্চে কেন? তোমার চক্ষু যে রক্তবর্ণ হ'যেছে? তোমার সর্ব্ব শরীর টল্ টল ক'চ্চে কেন? তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখে যে ভয় হ'চ্চে!

পাঠক! ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চরম ফল দেখ। স্বজনী বারুণীপানে উন্মত্ত; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বস্ব হরণে লোলুপ।

আজ কাল নবীন যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরা পানটি একটি সভ্যতার অঙ্গ। যিনি পান না করেন, তিনি ইহাদের নিকট মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হন না। কালভুজঙ্গিনী সুরা কি মানবের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া পশুরূপে পরিগণিত করে না? সুরাপানে মানবের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমদায়কে দূর করিয়া দিয়া কি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়কে প্রশ্রয় দেয় না? সুরাপানে কি ধনক্ষয় হয় না? ভাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য! বল দেখি, ইহা সত্য কি মিথ্যা! সুরাপানে কেবল মাত্র ধনক্ষয় হয় না। সুরাপানে আয়ুক্ষয়, দেহক্ষয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ধনক্ষয় করিয়া মানবের সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটন করাইয়া দেয়। শুদ্ধ সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় না; সকলের নিকট হেয়জ্ঞান করায়। যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সে কাহারও নিকট সম্মান পায় না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে ও মাতাল বলিয়া গালি দেয়। কি পিতা মাতা কি ভাই বন্ধু, কি স্ত্রী পুত্র, কেহই তাহাকে মান্য করে না, শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না, ও ভাল বাসে না। আহা! এই কালভুজঙ্গিনী সুরা

কি অশুভক্ষণেই ভারতে পদার্পণ করিয়াছে। ভাই মদ্যপ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, একবার জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ দেখি। এই কালকূট বিষ কাহাদিগের দ্বারা এই স্বর্ণভূমি ভারতে আনীত হইয়াছে? কাহাদিগের প্ররোচনায়, কাহাদিগের অনুকরণে তোমরা ঈদৃশ আচরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছ। তোমাদের ঈদৃশ আচরণে ও অনুকরণে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি। একবার এই অর্থলোলুপদিগের আচরণ দেখ। একবার ইহাদের অর্থগ্রহণের উপায় অবলোকন কর! একবার ইহাদের ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ! তাহা হইলেই তোমাদের ক্ষে যথেষ্ট শিক্ষা হইবে, - তাহা হইলেই তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে,—তাহা হইলেই তোমরা আপনা আপনি সতর্ক হইতে শিখিবে তাহা হইলেই তোমাদের চক্ষু ফুটিবে। ভাই মদ্যপ! একবার বল দেখি, একবার স্বীকার কর দেখি যে, এই মায়াবিনী পিশাচিনী সুরার আস্বাদন পাইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছিলে? এই ভয়ানক কালরূপিণী সুরার আস্বাদন যে একবার পাইয়াছে, সে আর ইহাকে ভুলিতে পারে না। মানব এমনই ভ্রান্ত, এমনই ইহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ যে, শত সহস্র গালাগালি খাইয়াও শত সহস্র উপদেশ পাইয়াও, ইহার ভয়ঙ্কর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও ইহার ভীষণ হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না।

ভাই মদ্যপ! আর কেন বৃথা অর্থনষ্ট করিয়া আপনার সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় কর? আর কেন জনসমাজে আপনাকে ঘৃণিত ও অপদস্থ কর? আর কেন এই কালকূট অপেক্ষা ভয়ঙ্করী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আয়ুক্ষয় ও দেহক্ষয় কর?

আর কুসুমকুমারী কি করিতেছেন?

কুসুমকুমারী সেই অন্ধকারময় নির্জ্জনপুরীতে একাকিনী অসহায়া বন্দিনী। অসহায়া রমণীর অতৃপ্ত যৌবনে কোন আশাই মিটিল না, কোন আশাই

সফল হইল না, কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না। চিরজীবনের জন্য তাহাকে অকুলপাথারে ভাসিতে হইল—জন্মের মত তাহাকে চিরশান্তির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইল—কিন্তু তথাপি সবলা পাষাণে বুক বাঁধিয়া নিদারুণ অন্তর্জ্বালা সহ্য করিয়া, কায়মনোচিত্তে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া, সেই একমাত্র নলিনীকান্তের উপাসনা করিতেছে। কখনও ভাবিতেছে, হায়! আমি কি অভাগিনী। আমার ন্যায় অভাগিনী রমণী আর কে আছে? আমার আশা ভরসা সমুদায় ছাই হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা কোন মতে নিবিতেছে না—অভাগিনী রমণী আর কি করিবে? কায়মনোবাক্যে, প্রফুল্লচিত্তে ঈশ্বরের নিকট স্বীয় প্রাণকান্তের মঙ্গল কামনা করিতেছে। জগতে ইহাদের ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা আর কে আছে? ইহাদের ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণ আর কার আছে? ইহাদের ন্যায় পতিব্রতা আর কে আছে?

সহসা স্বজনীকান্ত সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। স্বজনীর সেই ভীষণ আকৃতি, মুখের সেই দুর্গন্ধময় সৌরভ, বসনের বিশৃঙ্খলতা, মস্তিকের অস্থিরতা, সেই রোষপরিপূর্ণ লোচনযুগল দেখিয়া অভাগা রমণী একেবারে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। মুহুর্মুহুঃ প্রাণের আশঙ্কা করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে স্বীয় সতীত্বের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছে। দণ্ডে দণ্ডে স্বীয় বিপদ আরও কত গুরুতর হইবে, ইহাই চিন্তা করিতেছে।

স্বজনীর বুক আজ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, স্বজনী আজ ঘোর অত্যাচারী নারকী। স্বজনী আজ কোমল বালিকার অন্তঃকরণে নিদারুণ বিষজ্বালা প্রদানে উৎসুক। স্বজনীর আজ কাকুতি মিনতি নাই, স্বজনীর আর সে মিষ্টকথা নাই, স্বজনীর আর সে জ্ঞান চৈতন্য নাই, স্বজনী এক্ষণে এই অসহায়া বালিকার সতীত্ব হরণে উদ্যত। ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভ্রাতাকে জন্মের মত অকুল পাথারে ভাসাইয়াছে। খুল্লতাতের বিষয় আশয় সমুদায় হস্ত-

গত করিয়াছে। এক্ষণে এই কোমল বালিকার সতীত্বনাশে বদ্ধপরিকর।

স্বজনী। ভাল চাও ত এখনও সম্মত হও, আমার মতের পোষকতা কর; নহিলে মহান্ বিপদ ঘটিবে।

কুসুম। স্বজনী। প্রাণ যায় সেও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তথাপি প্রাণান্তেও তোমাকে পতীত্বে বরণ কর্‌তে পার্‌ব না—তোমার মতে পোষকতা কর্‌তে পার্‌ব না—তোমার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী হ'তে পার্‌ব না। তুমি আমাকে কি বিপদের ভয় দেখাও? আমার আবার বিপদ কি? যে দিন হ'তে এই অন্ধকারময় কূপে এসে বাস করছি, যে দিন হ'তে আমার এ সংসারের একমাত্র সহকারি তরু হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, যে দিন হ'তে পিতা, মাতা, সহোদরা-সদৃশা-ভগ্নি হেমপ্রভার নিকট হ'তে বিচ্যুত হয়েছি, সেই দিন হ'তে আমার বিপদের চরমদশা উপস্থিত হয়েছে। ইহা অপেক্ষা আর আমার কি নূতন বিপদ ঘট্‌তে পারে? তুমিও ঘৃণিত, কলুষিত কথা আর আমায় শোনাইও না। দূর হও! পাপিষ্ঠ দূর হও। এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

রে পাপিষ্ঠ নরাধম ঘোর অত্যাচারী!
কি সাহসে এলি তুই ধরিতে বসন?
জানিস্ না, সতী সাধ্বী কুলবতী নারী
নাশিতে পারে না কভু সতীত্ব রতন?

প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী অমূল্য রতন
সতীর সতীত্ব, তাই হরিতে বাসনা?
এখনি করিব এই দেহ বিসর্জ্জন,
ভুঞ্জিতে না হবে কভু বিষম লাঞ্ছনা।

একবার ভেবে দেখ, পাপিষ্ঠ বর্ব্বর!
এ পাপের পরিণাম বারেকের তরে,
মদ গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে আইলি সত্বর,
প্রকাশিতে বল তুই রমণী উপরে?

সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মী, যাঁরা ভুবনে পূজিত,
যাঁহাদের যশ গান করে নর নারী,
যাঁহাদের নাম আছে স্বর্ণে লিখিত,
সুপ্রভাত হয় দিবা যাঁহাদের স্মরি।

একবার চেয়ে দেখ, ওরে নরাধম!
কি ভীষণ পাপে তুই সদা নিয়োজিত,
হেন কার্য্য নাহি তোর অসাধ্য সাধন
সাধিতে মুহূর্ত্তে পার না ভাবি উচিত।

সাধ্বী, সতী যদি হই, বচন আমার
কভু না খণ্ডিবে, ওরে পিশাচ অধম!
ভুবন মাঝারে বল সাধ্য আছে কার,
সতী-বাক্য হেলা করে, ওরে নরাধম!

যে জ্বালায় জ্বলিতেছে হৃদয় আমার
শতগুণ জ্বলিবেক, ও পাষাণ প্রাণ!
অনুতাপানলে হৃদি দহিবে তোমার,
পাপকীর্ত্তি সবে তোর করিবেরে গান।

ধরিলি যে হস্তে তুই, ওরে পাপাধম!
যে হাতের পরশনে হইনু মূর্চ্ছিত,
সেই হস্ত খণ্ড খণ্ড হইবে যখন,
না কহিবে লোকে, মোরে ওরে কলঙ্কিত।

দেখিলি যে পাপনেত্রে, ওরে পাপাশয়!
যে আঁখিতে মজাইলি কুলবতী নারী,
যে আঁখিতে হ'লো তোর পাপের আশ্রয়,
মৃত্যুকালে সে আঁখিতে না ঝরিবে বারি।

রে পাপাত্মা! দুরাচার! এখনও সর,
বিরত হও এবে পাপ পথ ত্যজি,
না লঙ্ঘিবে কভু বাক্য বচন আমার,
যমালয়ে যেতে হবে কালি কিম্বা আজি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

ধূলার শরীর ধূলায় মিশাইবে।

পাঠক মহাশয়! আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নলিনীকান্ত কি এ সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? যে কামিনী পতি-সোহাগিনী প্রেমপরায়ণা হইয়া নিরুদ্দেশা, আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাসাদে বসিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন?

তা নয়। নলিনীকান্তের আর সে দেহের কমনীয়তা নাই, আর সে প্রকৃতি নাই, সে ধর্ম্ম ভাব নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে হাসি নাই। নলিনী আজ কনিষ্ঠ সহোদরের অসদৃশ আচরণে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষা নিঃস্ব; নলিনী আজ সংসারে উদাসী হইয়াছেন, তাঁহার আর সংসারে থাকিতে স্পৃহা নাই। যে ভ্রাতাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, যে ভ্রাতার সামান্য মাত্র অসুখ দেখিলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন, যে ভ্রাতার সামান্য মাত্র বিপদ উপস্থিত দেখিলে বুক পাতিয়া অনায়াসে সকল কষ্ট সহ্য করিতেন, আজ সে সজনী তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণে উদ্যত! শুদ্ধ সর্ব্বস্ব লইয়া নিশ্চিন্ত নয়, তাঁহার প্রাণ-সংহারে কৃতসঙ্কল্প! উঃ! পাপের কি ভীষণ প্রভাব। জগতে ইহা অপেক্ষা আর কি ভীষণ কার্য্য আছে? কে বলে, এ জগতে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা সার বস্তু? কে বলে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলে তাহার এ সংসারে বিপদ নাই? আজ জানিলাম, আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, জগৎ পাপে পরিপূর্ণ। পাপের উন্নতি ও ধর্ম্মের অবনতি। আজ জানিলাম, আজ শিক্ষা করিলাম, পাপই জগতের একমাত্র আশ্রয়।

পাপাবলম্বনে সকল বাঞ্ছাই সফল হয়। ধর্ম্মের হত্যার হইয়াছে, মানীর মান্য নাই। যাহার সম্পদ—তাহারই মান, তাহারই সর্ব্বস্ব।

আবার কখনও চিন্তা করিতেছেন যে, আর এ পাপ সংসারে থাকিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ করিবার আবশ্যক কি? সংসারে প্রাণ-সদৃশ সহোদর যখন আমার জীবন গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প—ধনসম্পত্তি অপহরণে লোলুপ—প্রিয়তমা কুসুমকুমারী নিরুদ্দেশা; তখন এ জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আজই এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিব—আজই প্রিয়তমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইব। দেশে দেশে, নগরে নগরে, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রিয়তমার অন্বেষণ করিব। যেখানে প্রিয়তমা গিয়াছে, সেখানে আমার সর্ব্বস্বই গিয়াছে—শুদ্ধ কায়ামাত্র পড়িয়া আছে—আমার মন প্রাণ সকলই সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে। যে ভ্রাতা আমার ন্যায় উপকারী, হিতকারী জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর বল প্রকাশে উদ্যত; তা'র আর এ জীবনে মুখাবলোকন করা কোন মতেই উচিত নহে, কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যতদিন না তাহার মন অনুতাপানলে দগ্ধ হ'বে, যত দিন না তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে যতদিন না তা'র মনে শান্তির উদ্রেক হ'বে, তত দিন আর তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব না। আমি প্রাণান্তেও তা'র অনিষ্ট কামনা করব না—সর্ব্বদা সেই করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট তা'র ইষ্ট কামনা করব, কখনও তা'র অমঙ্গল প্রার্থনা কর্‌ব না, সর্ব্বদাই কায়মনোচিত্তে সেই অনাদিদেবের নিকট প্রার্থনা কর্‌ব যে, হে পতিতপাবন! আমার সহোদরের মন পবিত্র করুন, মনে শান্তি বিরাজ করুক।

পাঠক! দেখুন, নলিনীকান্তের কি অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ! কি অকৃত্রিম ভালবাসা! যে ভ্রাতা সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত, তাহারও ইষ্ট বই অনিষ্ট কামনা করিতেছেন না। কি ধৈর্য্যগুণ! যে, অনায়াসে সমুদায় ভুলিয়া গিয়া সহোদরের শুভোদ্দেশে ইষ্ট কামনা করিতেছেন, প্রাণান্তেও

তাহার অনিষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন না। ইহা জগদীশ্বরের অপার্থিব মহিমা, সেই করুণাময় পরমেশ্বর কাহাকেও অনিষ্ট করিতে আদেশ করেন নাই। হাজার শত্রুই কেন হউক না, শত সহস্র অনিষ্ট সম্পাদনে কেন কৃতসঙ্কল্প হউক না, আমি কেন তা'র অনিষ্ট করব? আমি অনিষ্ট কর্‌বার কি শাস্তি দিবার কে? কা'র এমন সাধ্য আছে যে, সেই অনাদিদেব বিপদ-তারণ ভগবানের নিয়ম বিরুদ্ধাচরণ করে?

পাঠক! আসুন, বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রের কোন খবর পাওয়া যায় নাই—এক্ষণে সুরেন্দ্র কি করিতেছে, একবার পর্য্যালোচনা করিগে।

সুরেন্দ্র হেমপ্রভার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নানা দেশ, নানা বন, নানা উপবন পরিভ্রমণ করিয়া, কোথাও কুসুমকুমারীর অনুসন্ধান পাইলেন না! তাহার সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। তিনি হেমপ্রভার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভগ্নির অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কই তাঁর ত মনোরথ সুসিদ্ধ হ'ল না? কই, তাঁর চেষ্টা ত সফল হ'ল না? তাঁহার অধ্যবসা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল; তাঁহার মন দিন দিন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাঁহার আশা ক্রমশঃ নৈরাশ-সাগরে ভাসমান হইতে লাগিল। তাঁহার এতদিনের পরিশ্রম, ক্লেশ, মানসিক যন্ত্রণা সমস্তই বিফল হইল। তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার চিত্তের আর স্থিরত থাকিল না। তিনি এক একবার যখন স্বীয় প্রাণপ্রতিমার বদনকমল চিন্তা করেন, অমনি তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনের কথা মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকে; তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাভাব সঞ্চার হইতে থাকে; অমনি তিনি বিশ্রামসুখ অনুভব না করিয়া এ দেশ, ও দেশ, নানা স্থান অনুসন্ধান করেন।

প্রায় এক বৎসর হইল তিনি হেমপ্রভার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিয়াছেন। এই এক বৎসর ধরিয়া তিনি হেমপ্রভার বদনসুধাপানে বঞ্চিত। এই এক বৎসর ধরিয়া তিনি কতবার হেমপ্রভার কথা মনে করিয়াছেন, কত বার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন, কত বার চিন্তা করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, অমনি আবার কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত। আজ আর তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আজ সেই প্রিয়তমার কথা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র তিনি একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন; আজ তাঁহার সেই বদন-ইন্দু-শোভা সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, আজ তিনি কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন।

অপরাহ্ন কাল উপস্থিত। অপরাহ্ন উপস্থিত হওয়াতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সে উগ্রকর মূর্ত্তি নাই, সে উগ্রকর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সে প্রখর কিরণ নাই, সে কিরণ এক্ষণে শীতল হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সেই রক্তিমাবর্ণ কিরণ সমুদায় বৃক্ষের অগ্রভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, বৃক্ষ সমুদায় মধ্যাহ্নকালীন রবিতাপে তাপিত হইয়া এক্ষণে রাগভরে রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় প্রণয়িনীর চিন্তা করিতে করিতে নিরাশহৃদয়ে ভাগীরথীর সন্নিকটস্থ এক ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্মশানের ভীষণভাব অবলোকন করিলে জীবিত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, মৃতব্যক্তি পর্য্যন্তও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে কোথাও বা অঙ্গার, কোথাও বা অর্দ্ধপ্রজ্বলিত কাষ্ঠফলক, কোথাও বা অস্থিচূর্ণ, কোথাও বা মৃতব্যক্তির খট্টা, কোথাও বা ছিন্নবস্ত্র, কোথাও বা বিকৃতাকার শব দেখিয়া মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে থাকে। শ্মশানে মায়া, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য কিছুই থাকে না। মনোমধ্যে শোক, দুঃখ, ভয়, ভাবনা কিছুই স্থান পায় না। মন উদাসভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ঐশ্বরিক চিন্তা আসিয়া মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকে। তখন

আর পিতামাতা, ভাইভগ্নী, স্ত্রীপুত্র কাহারও চিন্তা মনে হয় না। কেবলমাত্র সেই ভূতভাবন ভগবানের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, মানবের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ, স্ব স্ব পাপের পরিণাম ফল, এই সমুদায় চিন্তা আসিয়া মনকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। তখন গতানুশোচনায় মন আকুলিত হইয়া করুণরসে ডুবিতে থাকে। তখন জগতের সকল সামগ্রীই 'আমার নহে' বলিয়া অনুমিত হয়। তখন আর পার্থিব সুখের প্রতি দৃষ্টি থাকে না; তখন আর প্রিয়তমার কথা মনে স্থান পায় না; তখন আর পুত্রকন্যাদিগের অনুপম সৌন্দর্য্যশোভা মনোমধ্যে উদিত হয় না, তখন আর স্বীয় সন্তানের অমৃতময় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত স্বর কর্ণবিবরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। এই যে নশ্বর দেহ, যে দেহের জন্য মানব কত যত্ন, কত সৌন্দর্য্য, কত পরিপাটী করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহের পরিণাম কি হইবে, যাহারা একবার চিন্তা করে না, যাহারা কেবল মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, যাহারা নীচাধমদিগের প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করে না, যাহারা ভিক্ষুকবৈষ্ণব দেখিলে একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা দেয় না, যাহারা কাণা, খোড়া, অন্ধ ও পঙ্গুদিগের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করে না, যাহারা দুঃখীদিগের শতসহস্র ক্রন্দনেও কর্ণপাত করে না, তাহারা আমার ন্যায় একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুক যে, তাহাদের সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ (যে দেহ আজ আছে, কাল নাই; তাহাদের সেই অসীম ধনরাশি, যে ধনরাশি এই আছে আর নাই) কোথায় থাকিবে, কোথায় যাইবে, কি হইবে একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখুক, তাহারা এই অপূর্ব্ব রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপনীত হউক, তাহারা এই ভীষণ স্থানে আসুক। এই স্থান মহাশিক্ষার মহাচিত্র। তুমি যতই পুণ্য কর না কেন, যতই ঐশ্বরিক চিন্তায় সময়াতিপাত কর না কেন, তুমি যতই নিষ্পাপী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হও না কেন, কিন্তু এই স্থানে তোমাকে একবার আসিতেই হইবে; এই মহাতীর্থে একবার আশ্রয় লইতেই হইবে। আর আমি যতই পাপকার্য্য করি না কেন,

আমি যতই অধর্ম্ম করি না কেন, আমাকেও একদিন এই স্থানে আশ্রয় লইতে হইবে। তুমি নাস্তিক হও, তুমি দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার না কর আর ঈশ্বর নাই বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তোমাকেও এক দিন এখানে আসিতে হইবে। আর আমি আস্তিক হই, দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করি, আমাকেও এখানে আসিতে হইবে। তোমার যতই সাহস থাকুক না কেন, তোমার যতই পুরুষত্ব থাকুক না কেন, এক সময়ে তোমাকে এই স্থিরগম্ভীর মহাশ্মশানের আশ্রয় লইতেই হইবে। তবে মানব, কিসের নিমিত্ত গৌরব করে? কিসের নিমিত্ত গর্ব্ব করে? কিসের নিমিত্ত অহঙ্কার করে? কিসের নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা করে?

এই মহাশ্মশান বিশ্ব-নাট্যশালার যবনিকাপতনস্বরূপ। মানব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে জীবনান্তের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই সুবৃহৎ নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া কত প্রকার লীলাখেলা করিতেছেন, কত প্রকার রঙ্গ-ভৌমিক দেখাইতেছেন, পরে এই বিশ্ব-নাট্যশালার যবনিকাপতনস্বরূপ শ্মশানক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, স্ব স্ব রঙ্গভঙ্গ, লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া নশ্বর দেহ বিনষ্ট করিতেছেন। এই শ্মশানক্ষেত্রে রাজাপ্রজার বিভিন্ন ভাব নাই। আজ তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, অতুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া, প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত করিয়া চিতাশয্যায় শয়ন করিলে; দুই দিবস পরে তোমার নশ্বর দেহের আর চিহ্নমাত্রও থাকিল না। তোমার ধূলার শরীর ধূলায় মিশাইল। আর আমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতঃ অনন্ত দুঃখে দিন অতিবাহিত করিয়া, নানা-প্রকার পাপকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বীয় জীবলীলা সাঙ্গ করতঃ এই মহা শ্মশানের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। এখন তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। এখানে বৈষম্য নাই, কেবল সাম্যেরই প্রবেশাধিকার আছে। পৃথিবীতে যত প্রকার মানব দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বৈষম্য ভাব। কাহারও মনে তেজ, কাহারও মনে গর্ব্ব, কাহারও মনে খর্ব্ব, কাহারও

মনে অহঙ্কার, কাহারও মনে নিরহঙ্কার, যত প্রকার বৈষম্য থাকুক না কেন, কিন্তু এই বিশ্ব-নাট্যশালার অপূর্ব্ব রঙ্গভূমি মহাশ্মশানক্ষেত্রের অবারিত তোরণসীমায় কোন প্রকার বৈষম্য প্রবেশ করিতে পারিবে না। এখানে কি রাজা কি প্রজা, কি ভদ্র কি ইতর সকলেরই যে এক দশা, তা এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র প্রমাণস্থল এই মহাশ্মশান।

সুরেন্দ্র এই চিন্তা করিতেছেন আর বলিতেছেন যে,আজ এই শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, জগতের সমস্তই এক; সুতরাং সবই সমান। উঃ! আমি কি স্বার্থপর! সামান্য রমণীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে বিমুগ্ধ হইতেছিলাম? ধিক্ আমার মানসিক বলকে! ধিক্ আমার পুরুষত্বকে! ধিক্ আমার প্রতিজ্ঞাকে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং

আনন্দনগরের একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে দুইজন রমণী কি কথোপ-কথন করিতেছেন, পাঠক! আমার সহিত একবার প্রবেশ করুন। গ্রন্থকারদিগের অবারিত দ্বার; তাঁহারা কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না, কাহারও নিষেধ মানেন না, কাহারও উপরোধ রাখেন না। যেখানে অঙ্গনারা বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, সেখানেও তাঁহাদের যেমন অধিকার; যেখানে প্রণয়ি প্রণয়িণীর সহিত রহস্যালাপে ও আমোদ প্রমোদে সময়াতিপাত করিতেছেন, সেখানেও তাঁহাদের সমান অধিকার।

মনোরমা স্বীয় দুহিতার জন্য এতদূর উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও শোকের উদয় হয়। তাঁহার আর সে সুন্দর কান্তি নাই, সে সুন্দর মূর্ত্তি নাই, সে মন নাই, সে প্রাণ নাই। তাঁহাতে আর সুখের লেশ মাত্র নাই। যে পতিপ্রাণা মনোরমা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পতির মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন, যে মনোরমা পতিসেবা করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন, যে মনোরমা অহঃনিশি কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন, আজি সে মনোরমা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায়, অমানিশার অন্ধকারের ন্যায়, প্রাভাতিক চন্দ্রের ন্যায়, মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন কৃশ ও শীর্ণ হইতেছেন। আহারে আর তাঁহার স্পৃহা নাই, শয়নে তাদৃশ ইচ্ছা নাই, বসনভূষণে আর যত্ন নাই, সাংসারিক কার্য্যে আর মন নাই। ফলকথা সুখের সঙ্গে আর তাঁর কোন সম্পর্কই নাই। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন। সর্ব্বদা একাকিনী থাকিয়া হতাশের ন্যায় বিলাপ করেন, আক্ষেপ করেন এবং উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করেন।

মনোরমার অস্ফুট রোদনধ্বনি শ্রবণমাত্রেই হেমপ্রভা স্বীয় শয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করেন, সান্ত্বনা করেন। পরে কিছু শান্ত হইলে তাঁহাকে শয়ানে শয়ন করাইয়া নিজে শয়ন করেন। যে দিবস কিছু বাড়াবাড়ি হয়, সে রাত্রে আর কাহারও নিদ্রা হয় না।

আজ আবার মনোরমার হৃদয় বেগ উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই হেমপ্রভা, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করিতেছেন।

মনোরমা। হেম! যেখানে আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব কুসুম গে'ছে, যেখানে আমার ননীর পুতুল গে'ছে, আমিও সেইখানে যাই। কুসুম কি আর আমার বেঁচে আছে? মা আমার কি অশুভক্ষণেই সেদিন

নলিনের সঙ্গে দেখা ক'ত্তে গে'ল, কি মনের এত দুঃখ হ'ল যে, আর একবার ঘরে ফিরে এলো না। মা'র মনে এমন কি কষ্ট হ'ল যে, আর একবার আমার সঙ্গেও দেখা কল্লে না। অভাগিনীর অদৃষ্ট মন্দ, তা নইলে বা কেন এমন হবে? কে আমার এমন শত্রু হ'ল যে, অন্ধের নড়ীকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রাখলে। আমার মনে হ'চ্চে, যেখানে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা সতত বিরাজ, মা আমার সেই গোলকধামে চ'লে গে'ছে। সেইখানেই আমাদের আবার দেখা হ'বে। হেম! আর তুমি আমায় আশা দিও না। তোমার ঐ চাঁদ-পানা মুখখানি দেখলে, আর তোমার ঐ সুধাবিনিন্দিত অমৃতময় কথাগুলিন শুনলে, আমার অন্তঃকরণে আবার আশার সঞ্চার হয়। আমার আর আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছা করে না। নলিনকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে সে বলে, "মা! আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। আমার সঙ্গে দেখা ক'রেছিল সত্য বটে, আমার সঙ্গে অনেক পেটের কথাও ব'লেছিল সত্য; কিন্তু গৃহত্যাগ ক'রে যাবার ত কোন কথাই বলে নি? বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের জিজ্ঞাসা ক'ল্লে তারা বলে যে, আমি ও কুসুম সে রাত্রি বেড়াতে বেড়াতে আপনাদের বাড়ী এসেছি। কিন্তু সে রাত্তিরে ত আমি ঘর থেকে বেরুই নি। কি যে মাথা মুণ্ডু হ'ল, কে যে এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, কিছুই ত ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি না।"

হেমপ্রভা। মা! কেন আপনি এতদূর উতলা হ'চ্চেন? আপনার কুসুমকুমারী নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ প্রাণাধিকা ভগিনী কুসুমকুমারীর অন্বেষণে বহির্গত হয়েছেন, যখন এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নি; তখন কুসুমকুমারীর নিশ্চয়ই কোন অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মা! আপনার এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দেখবার জন্য কি এ হতভাগিনীকে লালন পালন কল্লেন? আমার মনে নিশ্চিত বোধ হ'চ্চে যে, কুসুমকুমারী কখনই আত্মঘাতী হন নি। আত্মঘাতী যে মহাপাপ;

যে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, সে যে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে, এ কথা আমি শত সহস্র বার কুসুমের মুখে শুনিয়াছি। বাল্যকালাবধি একত্রে বাস, একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, করাতে তাঁ'র মনোগত ভাব আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আপনি ওরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা আর মনে কর্‌বেন না, ওরূপ চিন্তা আর মনে স্থান দেবেন না। সই আমার শীঘ্রই ঘরে ফিরে আস্‌বে। শীঘ্রই আপনি তা'র সুকোমল মুখ চন্দ্রিমা দেখে আপনার নয়ন যুগলের পরিতৃপ্ততা সম্পাদন কর্‌বেন।

মনোরমা আর হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। প্রবোধ বাক্য আর তাঁহার চিত্তের সমতা করিতে পারিল না। তিনি আবেগে বলিতে লাগিলেন, হেম! মা আমার! আজ তোমার নিকটে আমার হৃদয়ের কপাট খুলি। আমি আর এ অন্তর্জ্বালা সহিতে পারি না। দেখ হেম! আমি এমনি পোড়া অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলুম যে, এ হতভাগিনীর পেটে এক ত একটা ছেলে হ'লো না। যদি একটা মেয়ে হ'ল, তা এমনি পোড়া কপাল যে, এক বছর ধ'রে মেয়েটা কোথায় গে'ল, কি হ'ল তা'র সন্ধানই নেই। আছে কি গে'ল, তা'রই বা ঠিক্ কি? পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রেছিলুম, কত গো-হত্যা, ব্রাহ্মণ-হত্যা ক'রেছিলুম, তাই এ জন্মে তা'র ফল ভোগ ক'চ্চি। আমি অতুল সম্পদের অধিকারিণী হ'য়েও আমার অন্তরে যে বিষের জ্বালা জ্বল্‌ছে, তা আর কা'কে জানাব। হেম! তুমি এক্ষণে বালিকা নও; তোমার এক্ষণে জ্ঞান হয়েছে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি হয়েছে, তুমি এক্ষণে জগতের কিছু কিছু ভাব বুঝ্‌তে পেরেছ। তোমার সঙ্গে কথা কইতেও সুখ আছে। তোমার ঐ বিমল মুখচন্দ্রিমা দেখ্‌লে আমার সমস্ত মনস্তাপ দূরীভূত হয়, আমার মনে হয়, যেন সত্বরেই ঈশ্বর আমার হারানিধি মিলিয়ে দেবেন। কিন্তু মা! আর কত

দিন অন্তর্জ্জ্বালা সহ্য কর্‌ব, আর কতদিন আশাপথ নিরীক্ষণ ক'রে থাক্‌ব, আর কতকাল আশায় বুক বেঁধে রাখ্‌ব। কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে তিনি কেবল দুঃখ কর্‌তে থাকেন। তাঁহার দেহের আর সে প্রখর জ্যোতিঃ, সে কমনীযতা, সে প্রফুল্লতা, সে উৎসাহ কিছুই নাই। তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধি এক্ষণে লয়প্রাপ্ত হ'য়েছে। তাঁহার আর এক্ষণে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি নাই। তিনি এক্ষণে স্ত্রীলোকের ন্যায়, বালকের ন্যায়, উন্মাদের ন্যায়, অহর্নিশি কেবল রোদন ক'র্‌ছেন, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যা'চ্ছেন। বিষয় কর্ম্মে কিছুমাত্র মনযোগ নাই। শোকে তাঁহার দেহ জর্জ্জরীভূত ক'রে ফেলেছে। এই বলিয়া মনোরমা আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

হেমপ্রভা তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন এবং কুসুমকুমারীর নিমিত্ত নূতন নূতন উপায় অবধারণা করিতে লাগিলেন। তিনি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! শুনিলাম, সুরেন্দ্র নাকি এক্ষণে প্রয়াগতীর্থে অবস্থান করিতেছেন; শীঘ্রই তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দারজিলিং অভিমুখে যাত্রা করিবেন। আপনিও ত শীঘ্রই বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়াগতীর্থে গমন ক'চ্চেন। এ সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ মন যখন অস্থির থাকে, তখন আর একস্থানে বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। কেবল নূতন নূতন স্থান দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। তাহাতে মনের কথঞ্চিৎ সুস্থতা জন্মে। মন নূতন্ নূতন চিন্তায় নিমগ্ন হয়। তখন আর মানসিক চিন্তায় মনকে ততদূর আকুলিত কর্‌তে পারে না।

মনোরমা। মা! প্রযাগতীর্থে শীঘ্র যাত্রা কর্‌ব সত্য বটে, কিন্তু আর যে আমায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে এরূপ আশা নাই।

হেমপ্রভা। মা! ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের মনোবাঞ্ছা সফল ক'র্‌বেন। শীঘ্রই সইকে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী ফি'রে আস্‌বেন। গতরাত্তিরে স্বপ্নে দেখেছি যে, সই আমার নূতন বেশে নূতন পরিচ্ছদে বাড়ী ফি'রে

আস্‌ছে। তা'র সে অপরূপ রূপের কথা আর কি ব'লব! তা'র সে রূপ হঠাৎ দেখ্‌লে দেবী ব'লে ভ্রম হয়। মা! শুনিছি নিশা শেষের স্বপ্ন নাকি মিথ্যা হয় না! ঈশ্বর কি এমন সুদিন দিবেন?

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, মনোরমা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

হেমপ্রভা স্বীয় শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি হতভাগিনী! এক বছর হ'ল সুরেন্দ্রনাথের কোন খবর পেলুম না। এই এক বছরের মধ্যে তিনি কি একখানা পত্র লেখবার সময় পেলেন না? তিনি নিশ্চয় অভাগিনীকে ভু'লে গিয়েছেন। অভাগিনীর প্রতি তাঁর আর সে রকম ভালবাসা নাই; নচেৎ, এতদিনের মধ্যে তাঁ'র কোন না কোন খবর পাওয়া যে'ত। কখনও ভাবিতেছেন তিনি হয়ত কর্ত্তব্যপালনের বশবর্ত্তী হ'যে আমায় পত্র লিখ্‌তে অবকাশ পান নি। যে সময়ে তিনি আমায় পত্র লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌বেন, সে সময় তাঁ'র কর্ত্তব্যকার্য্যে নিয়োজিত হ'লে সার্থক হ'বে। যাহ'ক আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাঁকে আরও উত্তেজিত করা। এই বলিয়া একখণ্ড কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কতবার লিখিলেন, কতবার মুছিলেন, কতবার ছিন্ন করিলেন, তাহার আর স্থিরতা নাই। কিছুতেই তাহার মনোমত হইতেছে না। যেখানি তাঁহার অভিমত না হয়, সেখানি অকালে বিনষ্ট হয়। আবার একখানি নবজীবন প্রাপ্ত হইতে থাকে; সেখানিও অভিমত না হ'লে তা'রও ঐ দশা ঘটে। এইরূপ অনেক কষ্টে, অনেক অশ্রু বিসর্জ্জনে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। মনে মনে পত্রখানি আবার পড়িতে লাগিলেন।

প্রাণসম প্রিয়তম হয়, কি স্মরণ,
দাসী বলে একনারে ভ্রমে কি কখন ?
নিতান্ত অবলা আমি,
নাহি জানি ভিন্ন স্বামী,
সেই স্বামী তুমি মম দেহের জীবন ;
দাসী বলে একনারে হয় কি স্মরণ ?

দিনগত, রাত্রিগত, গত বর্ষপ্রায়,
তথাপি সংবাদ তব নাহি মিলে হায় !
ইহার কারণ যাহা,
জানেন ঈশ্বর তাহা,
ক্ষুদ্র বুদ্ধি এ দাসীর নাহি বুঝে হায়,
ভাবে বুঝি দোষে দোষী দাসী হবে তায়।

কভু হেন লয় মনে, প্রাণেশ আমায়
ভুলিয়াছ এ দাসীরে, মনে নাহি আর ;
কুহকী কুহক বলে,
ভুলায়েছে নাথে ছলে,
কিম্বা ভুলাইল রূপে প্রাণেশে আমার ;
তাই, এ দাসীরে বুঝি মনে নাহি আর ?

এ দাসীরে দাসীবলে মনে নাহি আর,
তাহাতে দুঃখিতা নহি, মিনতি আমার,
থাক নাথ সুখে থাক,
প্রেমিকার মান রাখ,
দাসীরে দিনান্তে কভু স্মরো একবার,
মনে রেখ পূর্ব্বপ্রেম, ভালবাসা আর ?

পূর্ব্বপ্রেম, ভালবাসা পার ভুলিবারে
পারহ ভুলিতে নাথ! চির অধিনীরে?
ভুলে যাও এ দাসীরে,
ভুলে থাক প্রণয়েরে,
তা'হে নাহি দুঃখমাত্র দাসীর অন্তরে,
কিন্তু অনুরোধ, ভুলনাহি প্রতিজ্ঞারে।

এ দাসীরে ভুলে থাক, ক্ষতি নাহি তায়;
পালিও যতনে কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞায়?
তা'হ'লে যথেষ্ট হ'বে,
দাসী সদা সুখে র'বে.
তোমার গৌরব খ্যাতি বাড়িবে ধরায়
না পর্শিবে কভু পাপ-কলঙ্ক তোমায়?

এ দাসীরে ভুলে থাক করনা স্মরণ?
স্বচ্ছন্দে করহ তাহা, যাহা চায় মন?
অনুরোধ এই মাত্র,
সতত লিখিও পত্র,
শান্তিদান কর লিখি মঙ্গল আপন;
দুঃখিনীর দুঃখ-নীর কর নিবারণ।

আর কি লিখিব, হায়! সুখের সংবাদ;
তোমা বিনা অভাগীর সকলি বিষাদ।
হ'য়ে আমি তব দাসী,
বিষাদ সাগরে ভাসি,
যেদিকে ফিরাই আঁখি নিরখি প্রমাদ।
তোমা বিনা অভাগীর সকলি বিষাদ।

মানব শরীরে নাথ এমনি মিলন,
একের অসুখে হয় দুঃখী অন্য জন।
মনের অসুখ বলে,
সতত মস্তক টলে,
অশান্তি, দুর্ব্বলতা সদা সর্ব্বক্ষণ,
চরণে দাসীর আজ এই নিবেদন।

অনুরোধ আর এক যুগল চরণে,
মনোহর এ উদ্যান রেখ এবে মনে;
মরি কি সুন্দর ভাবে,
পরস্পর প্রেমভাবে,
মাধবী তমাল যেন বেষ্টিত দুজনে
মনোহর দৃশ্য ইহা রেখ এবে মনে।

উপসংহারেতে নাথ এই নিবেদন,
ব্যথিতা দাসীর হৃদি তোমার কারণ;
নয়ন সলিলে হায়,
বক্ষঃস্থল ভেসে যায়,
তোমাবিনা কেবা মম আছে হেন জন,
সান্ত্বনা প্রদানে করে অশ্রু নিবারণ?

হেমপ্রভার পত্র লেখাও সমাপ্ত হইল, এদিকে আকাশও পরিষ্কার হইয়া আসিল। ঊষার রক্তিম আভা অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকালীন সুস্নিগ্ধ বাতাসে হেমপ্রভার অল্প অল্প তন্দ্রা আসিতেছে, এমন সময়ে মনোরমা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, মা, হেম!

হেমপ্রভার আর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি মনোরমার সেই

রক্তিমাবর্ণ লোচনদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া স্থির অনুমান করিলেন যে, মনোরমা আর সে রাত্রে নিদ্রা যান নাই। সারারাত্রি কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি মনোরমার এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমাকে কষ্ট দিয়ে আর কি ফল? কেবল নিজের শরীর মাটী করা বৈ ত নয়! রাতদিন কাঁদলে কাট্‌লেই বা আর কি হ'বে? যা'তে ভগ্নি কুসুমকুমারীর প্রকৃত অনুসন্ধান হয় তা'রই চেষ্টা করুন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। জগদীশ্বর অবশ্যই আপনার মুখ তু'লে চা'বেন। শীঘ্রই আপনার হারানিধি ফিরিয়ে পা'বেন।" হেমপ্রভা আর অধিক কথা বলিতে পারিল না, সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের বিষময় ফল।

কুসুমকুমারীর সেই জ্যোতিঃপূর্ণ বাক্যগুলিন স্বজনীর ভয়, লজ্জা, দুঃখ, নিরাশা পরিপূর্ণ তমোময় অন্তরে কিঞ্চিৎ আলোক প্রকাশ করিল। কুসুমকুমারীর সেই সুতীক্ষ্ণ বাক্যগুলিন তীক্ষ্ণ শেলসম তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতে লাগিল। মনে মনে কুসুমকুমারীকে শত শত ধন্যবাদ দিল, মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল, মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

স্বজনীকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া, কুসুমকুমারী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার বাক্যগুলিন বৃথা অপব্যয়িত হয় নাই। তাঁহার বাক্যাবলী বোধ হয় সুফল প্রদান করিল, তাঁহার বাক্যগুলিন

বুদ্ধি পশুবৎ সদ্ধিকেও বিচলিত করিয়া ফেলিল। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, সজনী। এখনও কি তো'র জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল না? এখনও কি তো'র অন্তঃকরণ অনুতাপানলে দগ্ধ হ'ল না? আর যে মুখে বাক্যস্খলন হয় না? আমার প্রতি কি বল প্রকাশ করবে, কর?

সজনী আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিল না; বলিল কুসুম। আজ হ'তে আমি জ্ঞানকে পাল্‌লুম, আজ হ'তে আমি উচিত শিক্ষা পেলুম আজ হ'তে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল, আজ হ'তে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আরম্ভ কল্লুম, আজ হ'তে আমার অন্তঃকরণে অনুতাপানল প্রবেশ করে হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল, হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আঘাত করতে লাগল, হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হ'তে লাগ্‌ল, কুসুম! বল আমাকে ক্ষমা ক'ল্লে? বল, আমার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা ক'ল্লে? বল, আমার জ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি ক'ল্লে? কুসুম! আজ হ'তে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ভিন্ন প্রকারে পরিণত হ'ল। বন্ধুর স্ত্রীকে যেরূপ ভালবাস্‌তে হয়, আজ হ'তে তোমাকে আমি সেইরূপ ভালবাস্‌ব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণীকে যেরূপ ভালবাস্‌তে হয়, আজ হ'তে আমি তোমাকে সেইরূপ ভালবাসব। দাদার সহিত তোমার শুভ সম্মিলন করাইয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। সজনী আর অধিক কথা বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। সজনী আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারিল না। তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

ঐ প্রকোষ্ঠে অপর একটি যুবতী অসহায়া অবস্থায় নিপতিতা। কিন্তু ইহার অন্তঃকরণে ত সেরূপ যাতনা অনুভূত হইতেছে না! ইহার মন কি বজ্র অপেক্ষা কঠিন যে, সজনীর এই ভীষণ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছুই চেষ্টা নাই? উঃ! এ কামিনী কে?

পাঠক! এই রমণীর কথা এক্ষণে আপনাদিগের নিকট যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।

এই রমণীর নাম শরৎকুমারী। ইনি কুসুমকুমারী অপেক্ষা কিছু বড়; কিন্তু দেখ্‌তে শুন্‌তে কোন অংশে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। মুখ খানিতে এখনও বেস কাঁচা কাঁচা ভাব আছে। রূপখানি যেন উথ্‌লে পড়্‌চে। ইনি কুসুমকুমারী অপেক্ষা কিছু মোটা; তা' ব'লে মোটায় বেমানান বা বেঢপ নয়; বরং দোহারা দোহারা গড়নে আরো শ্রী বেড়েছে। রং কিছু মাটো মাটো—তা' ব'লে পাঠক! খেমী, বামীর ন্যায় মিস্‌কালী, কিম্বা বসন্তের কোকিলের ন্যায় নয়। হাত, পা গুলি এমনই কোমল, যেন ননী দিয়া গড়া। গায়ে আদবে যেন হাড় নাই ব'লেই বোধ হয়। গলায় ৩৷৪ টা শাঁকের ন্যায় দাগ থাকাতে একরকম চমৎকার শোভাই হ'য়েছে। কুসুমকুমারীর চুল অপেক্ষা শরৎকুমারীর চুল কিছু খাট,—তা' ব'লে অধ্যাপক-ব্রাহ্মণের মাথার টিকির মত নহে, কিম্বা টিক্‌টিকির লেজ বলিয়া বোধ হয় না। মুখখানিতে সদাই হাসি লেগে আছে। এক মাথা চুলে, হাসি হাসি মুখে, বড় বড় চোকে ইনিও বড় ফেল্‌না নন। ইনিও একজন কেষ্ট বেষ্টর মধ্যে গণ্য। এর কথার মিষ্টতা, ধরণ ও বাঁধুনী দেখ্‌লে সর্ব্বদা শুন্‌তে ইচ্ছা হয় এবং কথা কইতে ইচ্ছে করে। এর সঙ্গে কথা কয়েও সুখ; কারণ, কথার উত্তর দিতে ইনি খুব মজবুত। সময়ে সময়ে পৌনে-ষোল-আনা, ষোলআনা রকমের উত্তর পাওয়া যায়। খুব রসিক, খুব আমুদে। অতি বড় শত্রু হোক্ না কেন, যে একবার এর কথা শুনেছে, যে একবার এর সঙ্গে আলাপ ক'রেছে,—সে আর কাছছাড়া হ'তে চায় না, তা'র মনে আর শত্রুতা ভাব থাকে না। তা'র রূপ দেখে, তা'র কথা শুনে, সে আর এক পা'ও নড়তে চায় না।

চুম্বকের যেমন আকর্ষণী শক্তি আছে, রূপে কি নাই? আছে। রূপের আকর্ষণ, কথার আকর্ষণ, প্রণয়ের আকর্ষণ আরও প্রবল, আরও

জোয়াল। শরৎকুমারীর রূপে খুব আকর্ষণ শক্তি আছে; নতুবা স্বজনীকান্ত এতদূর আকৃষ্ট হ'বে কেন? পোড়া চোক কেন যে রূপের এত পক্ষপাতী, রূপ দেখ্‌লে পোড়া চোক কেন যে সে দিকে এত দৌড়ায়, পোড়া মন কেন যে সে দিকে এত আকৃষ্ট হ'তে থাকে, তা' কে বল্‌তে পারে? অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি আছে, রূপেরও তেমনি আছে। আগুণের শোভায় যেমন কীট পতঙ্গ ঝাঁপ দেয়, এই পোড়া রূপের শোভায় তেমনি মন আকৃষ্ট হয় নতুবা স্বজনীকান্ত এই পোড়া রূপ দেখে কেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিবে? শুদ্ধ স্বজনীকান্ত কি এই দোষে দোষী? এই পোড়া রূপের জন্য কি কত লোকের প্রাণ, কত লোকের ধন, কত রাজার রাজ্য, কত লোকের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই? এই পোড়া রূপের জন্য কি সোণার লঙ্কা ছারখার হয় নাই? এই পোড়া রূপের জন্য কি গ্রীস, তুরস্ক ভস্মীভূত হয় নাই? এই পোড়া রূপের জন্য কি সোণার ভারত উচ্ছন্ন যায় নাই?

নারীর রূপের ভয়ানক শক্তি! ভয়ানক আকর্ষণ! ভয়ানক ক্ষমতা! ভযানক ধরণ! জলের মধ্যে যেমন বাড়বানল, মেঘের কোলে যেমন সৌদামিনী, জহরতের মধ্যে যেমন প্রাণনাশক বিষ আছে, পোড়া রূপের মধ্যেও তা'র চেযে অধিক ভযানক কারখানা আছে। জগদীশ্বর কি দুঃখের, আঁধারের, মনের মালিন্য দূর কর্‌বার জন্য এই পোড়া রূপের সৃষ্টি ক'রেছেন? যদি তা' হয়, তা' হ'লে এর ভিতর এত অনর্থ ঘটে কেন? এর ভিতর এত বিপদ কেন? রূপ ফুলে, পূর্ণিমার চাঁদে ও ক'চি ছেলের মুখে থাক্‌লেই ত চুকে যে'ত? তা' হ'লে ত আর কোন রাজ্য ধ্বংশ হ'ত না। তা' হ'লে ত সোণার ভারত উচ্ছন্ন যে'ত না! তা' হ'লে নরশোণিতে এ ভারত প্লাবিত হ'ত না! রূপ নারীর দেহে কেন? মাণিক কালসাপের মাথায় কেন? অতুল সম্পদ, মূর্খ ছেলের হাতে কেন?

হয়ত, কোন কোন পাঠিকা, এই সমুদায় কথা শুনে, আমাদের

এই পাগলামী লেখা দেখে, অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। পুস্তকের এই অংশ যদি আপনার ভাল না লাগে, তা' হ'লে এই পাতাটি আপনার সম্মুখস্থ ঐ দীপশিখার আহুতি দিন ; না হয়, আঙ্গুল মট কাইয়া পেট ভরিয়া গালি দিতেও কুণ্ঠিত হ'বেন না।

একটি কথা আছে,—যদি এই রূপ পবিত্র ভাবে থেকে আপনার ঘর আলো ক'রে রাখে, এই রূপ যদি স্বামীর পায়ে লুণ্ঠিত থাকে, তা' হ'লে এই রূপ এই জগতে অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ, অতি রমণীয়, অতি সুন্দর। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ সৌন্দর্য্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না, এ রত্নের জ্যোতিঃ সকল গৃহ আলোকিত করে না, এ পুষ্পের সৌরভ সকলের ভাগ্যে উপভোগ হয় না।

রূপে প্রাণের আশা, মনের আশা সংসারের সাধ মিটে কি ? রূপ অল্পদিনের জন্য! রূপ জোয়ারের জল! রূপ ধুয়ে খাবার জিনিষ নয়! রূপ পরকালের সম্পত্তি নয়! রূপ তু'লে রাখবার পদার্থও নয়! যে রূপ এত চঞ্চল, তা'র জন্য প্রাণের এত পিপাসা কেন ?

পাঠক! আমরা রূপের ভিখারী নই। রূপ ও ফুল উভয়ই সমান। ফুল যেমন আজ ফুটে, আজ বাহার দেয়, আজ গৌরব করে, আজ সৌরভে দেশ মাতাইয়া তুলে পাড়ায় কত মধুকর নিমন্ত্রিত করে ; বাতাস তা'র বুক হ'তে পরিমল নিয়ে চারিদিকে বিলাইতে থাকে— রূপও তেমনি যৌবনে ফুটে, দুইদিন বাহার দেয়, গৌরব করে, গুমরে দেশ মাতাইযা তুলে ; কিন্তু কাল যে তা'র সে রূপের কি দুর্দ্দশা হ'বে, কাল যে তা'র সে বাহার, সে চেহারা, সে গুমর, সে মধুকরের ন্যায় মধুরধ্বনি কোথায় থাক্‌বে, কোথায় যা'বে, কি হ'বে তা' বলা যায় না। তাই বলি, রূপ মিথ্যে। রূপ, লোক ভুলাইবার, চোক ভুলাইবার ফাঁদ। এই পোড়া রূপে যখন এত অনর্থ, এত বিপদ ; এই রূপের আলোয় সংসারের যে কি লাভ, একাল পর্য্যন্ত যখন কেউ দেখ্‌তে পেলে না, জান্‌তে পাল্লে না ; তখন মানব কেন

এই পোড়া রূপের জন্য এত লালায়িত হয়? তাই বলি পাঠক! রূপ ও ফুল তুইই এক।

মানুষের রূপ— গুণ। যাহার গুণ আছে, তাহারই রূপ আছে। এই যে রূপের ডালি অন্ধকারময় গৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে; এ রূপের যে কি গুণ, কি শক্তি, কি ক্ষমতা, কি আকর্ষণ তা' কে বল্‌তে পারে? যেমন আকাশের বুকে মেঘের কোলে বিদ্যুতের রূপের ছটায় জগৎ মাতায়ে তুলে, চোক ঝাঁঝিয়ে যায়; সে রূপ যেমন তফাতে থাকা ভাল; চোকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না; এ সংসারেও তেমনি অনেক যুবতীর সেই রূপ চোক ঝাঁঝান, দগ্ধকারী রূপ আছে, সে রূপের পরিণাম অতি ভয়ানক, অতি শোকজনক, অতি যাতনাদায়ক। যা'র শোভা সহ্য হয় না, সে শোভা দেখ্‌তে পোড়া প্রাণ কেন চায়?

আমাদের শরৎকুমারীর রূপও এই ধরণের।

পাঠক! রূপের কথা লইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে এই রমনীর পরিচয় দিয়া আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করি।

অমরেন্দ্রবাবুর বাটীর সন্নিকটে শরৎকুমারীর পিত্রালয়। শরৎকুমারীর পিতার নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমবাবু কৌলিন্যপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দুহিতার অতি শৈশবেই বিবাহ দেন। শরৎকুমারীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর। এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই অভাগিনী বাল্যবিধবা হয়। পতির আকৃতি যে কিরূপ, তাহা বালিকার স্মরণ হয় না। সুতরাং শরৎকুমারী বিবাহের কি সুখ, তাহা বুঝিতে পারে নাই। বাল্যকালাবধি স্বজনীর সহিত একত্রে বাস, একত্রে খেলা, একত্রে পাঠাভ্যাস করিত; সুতরাং সেই বাল্যভাব এক্ষণে ভালবাসারূপে পরিণত হইয়াছে। স্বজনীকে এক দণ্ড না দেখিলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই স্বজনীর সেই হাসিভরা মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা। সেই হাসি আর এক্ষণে প্রাণ-

ভরিয়া দেখিতে পায় না। পিতামাতার গঞ্জনায় স্বজনী আর তাদৃশ গতিবিধি করিতে পারে না। সেই জন্য অভাগিনী কুলে কালি দিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব-রত্নে জলাঞ্জলি দিয়া, এই অন্ধকারময় কূপে আসিয়া বাস করিতেছে।

স্বজনী অল্পে অল্পে এই কামিনীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বজনীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া রমণী একেবারে বিস্ময়াপন্ন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। স্বজনীকে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া, ও অবিরত শোকাশ্রু বিগলিত হইতে দেখিয়া, শরৎকুমারী মনে মনে বিবেচনা করিল যে, দারুণ মর্ম্মচিন্তায় স্বজনীর অন্তঃকরণকে আকুলিত করিয়া ফেলিয়াছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাহার দেহ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। স্বজনীর এতাদৃশ দুঃখের কারণ অবগত হইবার জন্য, রমণী আস্তে আস্তে ভয়বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, নাথ! আজ সহসা আপনার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ কি? এ অভাগিনী কি অপরাধে অপরাধী যে, আপনার প্রসন্ন বদনখানি দেখিতে বঞ্চিত? আমি আর কিছুরই প্রার্থী নহি, কেবল আপনার ঐ সহাস্য বদনখানি প্রাণভরিয়া দেখিব। আমার আর অপর সুখের প্রয়োজন নাই। আপনি হাস্যমুখে যখন আমার সন্নিকটে আসিয়া সোহাগ করিতে করিতে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন, কই, আজ ত তা'র কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্চি না? বুঝি অভাগিনীর কোন অপরাধ হ'যে থাকবে: নচেৎ বিধাতা এমন রত্নে আমায় সংঘটন করাইয়া অহর্নিশি দুঃখে অতিবাহিত করতে হ'বে কেন? আমার পিতা মাতা, ভাই, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব বর্ত্তমান থাকতেও কেন আমি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম? কেবল ঐ চাঁদমুখের হাসি দেখ্‌বার জন্য; কিন্তু বিধাতা একদিনও সে আশা আমার পূর্ণ ক'র্লেন না।

বাটী হ'তে বেরিয়ে আস্‌বার পর হ'তে আমার প্রতি আর সে ভালবাসা নাই, সে যত্ন নাই, সে সোহাগ নাই, সে কিছুই নাই। এখন আমি জানতে

পাল্লুম যে, পুরুষজাতি অতি শঠ, অতি প্রবঞ্চক, অতি মিথ্যাবাদী। যত দিন যৌবন থাকে, তত দিন কত আদর, কত সোহাগ, কত ভালবাসা কত যত্ন, কত ভাণ, কত ছলনা ক'রে অভাগা কুলবতীকে গৃহ হ'তে বাহির ক'রে আনে। পরে যৌবন অতিবাহিত হ'লে তা'কে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে তা'র জীবনের সুখ, জীবনের সম্পদ, জীবনের আনন্দ সমুদায় নষ্ট ক'রে অপর যুবতীর সতীত্বনাশে সচেষ্ট হয়। ধিক্ তাদের প্রণয়কে, ধিক্ তাদের ভালবাসাকে, ধিক্ তাদের জীবনকে। নতুবা কেন আমি দেবতাদুর্লভ অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিলাম? আমার কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের ভাবনা, কিসের চিন্তা? আমার পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, শ্বশুরশাশুড়ী সমস্তই বর্ত্তমান। এক্ষণে আর কোন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করব। কোন্ মুখে আর লোকালয়ে এ পোড়ামুখ দেখা'ব। স্বজনী! এই কি আমার ভালবাসার প্রতিদান! স্বজনী! তোকে আর কি বলব? যদি আমি বাল্যবিধবা না হতুম, যদি আমি পিতা মাতার অবাধ্য হ'যে তোর ঐ পাপমুখ না দেখতুম, তা' হ'লে আমাকে ঐ দুর্লভ সতীত্বরত্ন নষ্ট কর্‌তে হ'তো না।

স্বজনীকান্তের মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মনে ঘৃণার উদ্রেক হইযাছে। তাহার পক্ষে এক্ষণে শরৎকুমারীর ভৎর্সনা গুলি অতি মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, এই তিরস্কৃত বাক্য গুলি তাহার মনে আরও যন্ত্রণা দিতেছে, তাহার মনকে আরও দগ্ধ করিতেছে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। তাই আজ, স্বজনী-কান্ত স্থিরচিত্তে শরৎকুমারীর এই ভৎর্সনা সহ্য করিতেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, আরও কি দুর্ব্বাক্য বলে, তাই শুনিবার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

স্বজনীকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া শরৎকুমারীর রাগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল, "ওরে নরাধম! ওরে পাপিষ্ঠ স্বজনী! তোদের সমুদায়

আচরণ জানতে পেরেছি, সমুদায় শিক্ষা ক'রেছি। আজ তোর চর্ম্মচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেই, তোরে শিক্ষা প্রদান করি। "আয় নরাধম স্বজনী! আমার সঙ্গে আয়—আমার সঙ্গে দুরাচার লম্পট দিগের ভবনে ভবনে প্রবেশ কর, আমার ন্যায় বাল্যবিধবা রমণী-দিগের নিকট আগমন কর, আমার ন্যায় শত শত বাল্যবিধবা রমণী, দুরাচার লম্পটদিগের শত শত সহধর্ম্মিণী, দিবারাত্র কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা উপভোগ ক'চ্চে, একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। রে নরাধম! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, ঐ দেখ! দুরাচার লম্পটগণের সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীরা স্ব স্ব প্রাণেশ্বরের দর্শন আশয়ে বিবিধ বিলাস দ্রব্যে গৃহ সুসজ্জিত করতঃ নানাবিধ সৌগন্ধে গৃহের চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া, সারা নিশি জাগিতে জাগিতে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে, যামিনী অতিবাহিত ক'চ্চে। গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হ'ল, এ দিকে তাদের আশাপ্রদীপও সে দিনের মত নির্ব্বাণ হ'ল। ঐ দেখ নরাধম! তাদের সহধর্ম্মিণীরা নিশা অবসান দেখিয়া, অজস্র অশ্রুনীরে নয়ন ধৌত ক'রতঃ হৃদয়ের অসহ্য দাবানল নির্ব্বাণের বৃথা চেষ্টা করিয়া, স্ব স্ব গৃহধর্ম্মে মন নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা ক'চ্চে। এদিকে তোর ন্যায় নরাধম পরদারিকেরা স্ব স্ব উপ-পত্নীর আলয়ে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া, পিতামাতাকে অকথ্য, অশ্রাব্য কটূক্তিতে উদর পরিপূর্ণ করাইয়া, তাহাদিগের মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, সুখে তা'র ক্রোড়ে নিদ্রা যা'চ্চে।"

"আবার দেখ্ পামর! ঐ দেখ্! চেয়ে দেখ্! ঐ তপ্তকাঞ্চন-সদৃশবরণা, বিদ্যালঙ্কৃতা ষোড়শী যুবতী গললগ্নকৃতবাসে, কখনও বা কর-পুটে, কখনও বা স্বীয় কোমল করে স্বীয় প্রাণনাথের চরণযুগল ধারণ করিয়া কি বল্‌ছে; একবার শোন্। কখনও বা বলিতেছে, "হৃদয়েশ্বর! এ দাসীর বিনয়ভিক্ষা যে, অদ্য রজনী গৃহে অতিবাহিত করুন। আমি প্রাণভরিয়া আপনার পদসেবা করিয়া নয়নের প্রীতি সাধন করি, নারী-

জন্ম সার্থক করি। অদ্য প্রাণান্তেও আপনাকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দিব না।" পামর চেয়ে দেখ্! তোর সহচর বেশ্যাপদসেবীন্ কি ক'চ্চে, একবার দিব্যচক্ষে দর্শন কর্;—একবার তাহার নৃসংশ আচরণ প্রত্যক্ষ কর্। দেখ্! দেখ্! ঐ পামর স্বীয় ঋতুবতী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করতঃ তাহাকে সারারাত্রির মত নয়ননীরে ভাসাইয়া, তাহাকে পদদলিত করিয়া উপপত্নীগৃহে গমন করিবার জন্য উদ্যত হ'য়েছে। মাতা অনুরোধ করিতেছেন, ভগ্নী বাধা দিতেছেন, বন্ধুবান্ধব নিষেধ করিতেছেন, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কাহারও কথায় কর্ণপাত নাই, কাহারও উপদেশে গ্রাহ্য নাই—চাই সেই উপপত্নীর বিষাগ্নিসদৃশ মুখচন্দ্রিমা সন্দর্শন—চাই সেই পিশাচিনীর সহবাসসুখ—চাই সেই নরক প্রতিভাসদৃশ হাস্যবদন—চাই সেই বিষকুম্ভসদৃশ নরককুণ্ড অপেক্ষা ঘৃণেয় তাহার অধরসুধাপান—চাই সেই বিষাক্ত বাহুযুগলের আলিঙ্গন। সেই অশ্রদ্ধেয় ঘৃণাজনক কার্য্যে কাহারও বাধা না মানিয়া, গুরুজনের শতসহস্র উপদেশবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, বৃষ্টি, জল, ঝড়, তুফান প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, উপপত্নীসেবার জন্য গমন ক'চ্চে।"

"পামর! নরাধম! চেয়ে দেখ্! অপর দিকে ঐ দুরাচারের নৃশংস আচরণ একবার অবলোকন কর্! ঐ দুরাচারের পাষাণ অপেক্ষা কঠিন হৃদয়ের জঘন্য ব্যবহার এক বার প্রত্যক্ষ কর্! রে পিশাচ! একবার জ্ঞানচক্ষে চেয়ে দেখ্! ঐ পামর বেশ্যাপদসেবীন্ স্বীয় কনক-প্রতিমাসদৃশ সহধর্ম্মিণীর অঙ্গের অলঙ্কার গ্রহণ আশয়ে, স্বীয় উপপত্নীকে প্রদান করিয়া তা'র সোহাগ বাড়াবার জন্য, তা'র ভালবাসা পাবার জন্য তা'কে মনের সাধে সাজাবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী অবলা সরলার অঙ্গস্থ অলঙ্কার বলপূর্ব্বক উন্মোচন ক'চ্চে। বালিকা কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। বালিকা কি করবে? বালিকা অলঙ্কারপ্রিয়া। প্রাণের গহনাগুলি বৃথা নষ্ট হ'য়ে যা'বে, বৃথা অপাত্রে ন্যস্ত হ'বে ভেবে অনন্যোপায়ে করযোড়ে স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে সুমধুর

স্বরে ব'ল্‌ছে, "হৃদয়েশ্বর! চরণে ধরি, মিনতি করি, দাসীর বাক্য অগ্রাহ্য ক'র না, দাসীর কথায় কর্ণপাত কর। দাসী ঐ শ্রীচরণ ভিন্ন অন্য কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে না। ঐ পাদপদ্ম সেবা করবার জন্য লালায়িত। ঐ বদন-ইন্দু-শোভা সন্দর্শন করবার জন্য নয়ন মন সতত চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত। অনর্থক এই সমুদায় বহুমূল্য রত্নালঙ্কার লইয়া অপব্যয় ক'রে কি ফল? মনে করে দেখুন, এ সামগ্রী আপনি দিয়াছেন, আপনারই আছে। আমি অপর কাহাকেও দিচ্চি না, কিম্বা নষ্ট ক'রেও ফেল্‌ছি না। আপনার ধন আপনারই থাকবে। অসময়ে এর দ্বারা অনেক উপকার হ'বে। আমি ধনাকাঙ্ক্ষী নহি, বস্ত্রাকাঙ্ক্ষী নহি, অলঙ্কারাকাঙ্ক্ষী নহি, পৃথিবীর কোন সুখের আকাঙ্ক্ষাই রাখি না। শুদ্ধ কেবল আপনার নির্ম্মল চরিত্র, আপনার বিমল সুখ, আপনার মানসম্ভ্রম, আপনার সুখসমৃদ্ধি দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা করি। লোকে আপনার প্রশংসা করে, লোকে আপনার সুখ্যাতি করে, দশজনের নিকটে আপনি পরিচিত হন, চতুর্দ্দিকে আপনার যশঃ সৌরভ ছড়াইয়া পড়ে, ইহাই ইচ্ছা করি, ইহাই প্রার্থনা করি, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করি। স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন, কুলটারা সুখের অংশভাগিনী। যতদিন আপনার অর্থ আছে, যত দিন আপনার উন্নতির আশা আছে, তত দিন আপনার মুখাপেক্ষী। আপনার অসময় পড়লে একবারও ফি'রে দেখ্‌বে না। আপনার দুর্দ্দশা দেখে ক্রন্দন করা দূরে থাক্‌ হাস্‌তে থাক্‌বে, বিদ্রুপ কর্‌তে থাক্‌বে, উপহাস কর্‌তে থাক্‌বে। বিবেচনা ক'রে দেখুন, তখন আপনার মানসিক ভাব কিরূপ হবে! ভাবিয়া দেখুন তখন আপনার দুর্দ্দশা কিরূপ হ'বে! জগতে পিতা বল, ভাইবল, পুত্রবল, কন্যা বল, আত্মীয় বল, বন্ধু বল, সকলেই সুখের সময় আপনার হয়; কেবল জগতে মাতা ও স্ত্রী সুখের সময় সুখী ও দুঃখের সময় দুঃখী। ইহাদের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জগতে আর কেউ নয়। আপনি জননীর কথায় উপহাস ক'রে, তাঁকে

নানাবিধ দুর্ব্বাক্যে ভৎর্সনা ক'রে, তাঁকে নয়ননীরে ভাসিয়ে, আমার ন্যায় অভাগিনী রমণীর মর্ম্মস্থল ছিন্ন ক'রে, উপপত্নীর সুখের নিমিত্ত এই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলিন নিয়ে যা'চ্চেন। ভেবে দেখুন, এই সমুদায় অলঙ্কার কয় দিনের জন্য। ইহা নষ্ট হ'লে পর বাটীঘর বিষয় আশয় সমুদায় নষ্ট করবেন। তা'র পর আপনার কি দুর্দ্দশা হ'বে! হাতে পয়সা নাই, একটি পয়সার জন্য লালায়িত হ'তে হ'বে, এক কপর্দ্দকের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি করতে হবে, নয়ত পেটের দাযে চুরী করতে হবে। ইহাই ত এ কার্য্যের পরিণাম। আমি অভাগিনী দীনা, ক্ষীণা, বুদ্ধিহীনা; কোথায় আপনি হিতোপদেশ প্রদানে আমায় সুশিক্ষিতা করবেন? না, লজ্জার মাথা খাইয়া, আপনাকে আজ বুঝাতে হ'চ্চে। ধিক্ আমার অদৃষ্টকে! ধিক্ আমার জীবনকে! ধিক্ আমার প্রাণকে!"

"ঐ দেখ বারবিলাসিনী সহবাসক! একবার চেয়ে দেখ! তো'র সহচর ঐ মূর্ত্তিমতী সরলার কোমল মনে ব্যথা দিয়া, তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে করিতে, তাহার উপদেশ পূর্ণ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে সারারাত্রির মত দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করতঃ, পতিপ্রাণা সরলার গাত্রাভরণ বলপূর্ব্বক উন্মোচন করিয়া, নূতন ভাবে, নূতন পরিচ্ছদে, নূতন উৎসাহে, নূতন আমোদে আমোদিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ক'চ্চে। অভাগিনী রমণী আর কি করবে? কে তাঁকে আর সান্ত্বনা করবে? কে তা'কে আর প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করবে? কে তা'র আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করবে? অনাথিনী অসহায়িনী কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে মনের ক্ষোভ, মনের আক্ষেপ, মনের যাতনা সহ্য ক'চ্চে; আর সেই অনাদিদেব বিপদতারণ ভগবান্‌কে স্মরণ করতঃ, সেই পূর্ণব্রহ্মদেবের নিকট করযোড়ে স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ক'চ্চে—দেবদেবীর নিকট স্বামীর মনোবিকারের প্রতীকারার্থে নানাবিধ পূজার আয়োজন ক'চ্চে। ধন্য রমণীকূলের আদর্শ। ধন্য সতী

কুলের কুললক্ষ্মী! তোমার অধ্যাবসায়কে ধন্য! তোমার সহিষ্ণুতাকে ধন্য! তোমার জীবনকে ধন্য! হে হিন্দুকুললক্ষ্মী! তোমাদের ন্যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আর কে জানে? তোমাদের ন্যায় সতী সাধ্বী লক্ষ্মী, আর কে আছে? তোমরা দেবীর দেবী! ঈশ্বরীর ঈশ্বরী!"

"আবার নরাধম! ঐ দেখ! তোর সহচররা উপপত্নী ভোগে বহির্গত হ'য়েছে, আর তা'দের সহধর্ম্মিণীরা কি ক'চ্চে, কি জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত হ'চ্চে, একবার প্রত্যক্ষ কর। তো'দের কুচরিত্রতা দোষে তা'রা কিরূপ ঘৃণাকর কার্য্যে ব্যাপৃত হ'চ্চে, একবার জ্ঞানচক্ষে, একবার দিব্যচক্ষে অবলোকন কর! ঐ দেখ! দুরাচার লম্পটদিগের রমণীরা স্ব স্ব গৃহের কর্ম্মচারী দ্বারা, স্ব স্ব গৃহের ভৃত্যদিগের দ্বারা, স্ব স্ব বাটীর সন্নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগের দ্বারা, স্ব স্ব অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলী দিয়া, তো'দের পিতৃপুরুষের গৌরব খ্যাতি বৃদ্ধি ক'চ্চে। *স্ব স্ব বংশের যশসৌরভে দিক্ দিগন্তর পরিব্যাপ্ত ক'চ্চে!* তো'দের পাপের সংখ্যা আরও গুরুতর ক'রে তুল্‌চে! রে পামর বেশ্যাপদ-সেবীন্! তুই মনে করিস্ না যে, তুই একাকী এ পাপের পাপী। তো'র ন্যায় শত শত পুরুষ এই ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে কত প্রকার কুক্রিয়া ক'চ্চে, তা' আর কত বল্‌ব কত দেখাব।"

"ঐ দেখ! আমার ন্যায় অভাগিনী বাল্যবিধবারা অসহ্য বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে স্ব স্ব অমূল্য দেবতাদুর্লভ সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়ে ভ্রূণহত্যায় নিযুক্ত হ'য়েছে। ঐ দেখ! ঐ অসহায়িনী পতি সহবাসে বঞ্চিত হ'য়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'চ্চে। ঐ দেখ! ঐ অভাগিনী বিরহ বেদনায় অস্থির হ'যে হলাহল ভক্ষণে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ ক'চ্চে। ঐ দেখ! ঐ হতভাগিনী কি ক'চ্চে! ঐ হতভাগিনী গলায় কলস বন্ধন করতঃ, গঙ্গার অতল জলে নিমগ্ন হইয়া আপন প্রাণ বিসর্জ্জন্ দিতেছে।"

"ধিক্ দুর্জ্জনী! তোর ন্যায় দুরাচার লম্পটগণকে শত শত ধিক্!

পৃথিবীতে যত প্রকার বীভৎসজনক কার্য্য আছে, যত প্রকার ঘৃণাজনক কার্য্য আছে, তো'রা অবাধে তৎকার্য্যসাধনে তৎপর। তো'দের কুচরিত্রতা দোষে কত শত কুলকামিনীরা অসতী হইতেছে, কত শত কামিনীরা সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিতেছে, কত শত রমণীরা অকুল পাথরে ভাসিতেছে, তা'র এক নিদর্শন কেন আমাতেই প্রত্যক্ষ কর না। যদি তো'র প্ররোচণায় বিমুগ্ধ না হইতাম, যদি তো'র সৌভাগ্যসূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিতাম, যদি তো'র ঐ ঘৃণিত কলুষিত বদনের বিষাক্ত বাক্যাবলীর দিকে কর্ণপাত না করিতাম, তা' হ'লে আমাকে এই দুঃখপঙ্কার্ণবে নিমগ্ন হ'তে হ'ত না, আমাকে আর অকুল পাথারে ভাস্‌তে হ'ত না, আমাকে আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে ঘৃণা বোধ হ'ত না।" তো'র ঐ ঘৃণিত জীবনের পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমার এই শানিত ছুরিকা তো'র ঐ কোমল বক্ষে বিদ্ধ করিলাম—এই বলিয়া শরৎকুমারী স্বীয় কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করতঃ স্বজনার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল।

স্বজনীর রক্তাক্ত কলেবর ভূমে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্বজনীর বিলাপসূচক ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্বজনীর অনুতপ্ত হৃদয় শোকে বিগলিত হইতে লাগিল। স্বজনী বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার মর্ম্ম-বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে অন্ধকূপ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সংসার মৃত্যুর অধীন।

"খুব সাবধান! বৈশাখমাসে, যেন একসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীহত্যা না হয়!" এই কয়েকটী কথা কে মাঝিদিগকে বলিল। মাঝিরা শুনিতে পাইল কি না, কে বলিতে পারে? কারণ, জল ও ঝড়ের শব্দে কিছুই শোনা যাইতেছে না। কথা বাতাসে মিশাইয়া গেল। নৌকার ছাদের উপর শিলাবৃষ্টি চড়্ চড়্ শব্দ—ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। বৃষ্টি সকল তীরের ন্যায় গায়ে ফুট্‌ছে; ভাগীরথী আজ ভয়ানক চেহারা ধারণ করিয়াছে। জলরাশি কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঁচু হয়ে উঠ্‌ছে। একটির পর একটি তরঙ্গ গড়াতে গড়াতে এসে নৌকার গায়ে চড়াৎ চড়াৎ ক'রে লাগ্‌ছে। উড়ো ঘুড়ির সূতা কেটে গেলে যেমন হেল্‌তে দুল্‌তে নীচে পড়ে, সেইরূপ ক'রে নৌকাখানি ঘূর্ত্তে ঘূর্ত্তে হেলিতে দুলিতে নদীগর্ভে ভাসমান হইতেছে। আকাশ কতক্ষণ এরূপ ভীষণভাব ধারণ করিয়া থাকিবে? বিধাতঃ! তুমি স্থিরনদীকে খেপিয়া তুলিলে কেন? যে নদী ক্ষণকাল পূর্ব্বে লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল, কুলকুল্ রবে ধীরে ধীরে ভালমানুষের মত চলিয়া যাইতেছিল, সান্ধ্যগগনের অপূর্ব্ব শোভা বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছিল, সেই নদীর এখন এরূপ ভাব হলো কেন? সংসারের কি এই নিয়ম! প্রকৃতির কি এই খেলা! পরমেশ্বরের কি এই আমোদ! যা সুখের, যা আমোদের, যা ভালবাসার, তা'র কি এই ভীষণ পরিণাম! যে জল, যে বাতাস মানুষের প্রাণরক্ষা করিতেছে, আজ আবার সেই জল, সেই বাতাস, মানুষের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত! সেই মৃদু বাতাসের এত শক্তি! সেই তরল জলরাশির এত বিক্রম!"

"ক্রমশঃ জলঝড়ের গতি মন্দ হইতে আরও মন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঝড় ও জল আরও প্রবল বেগে হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে নৌকাস্থ সকলেই স্ব স্ব জীবননাশের আশঙ্কা করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে সেই বিপদতারণের নাম স্মরণ করিতেছে। ভয়ে, ভাবনায়, ত্রাসে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে হেমপ্রভা, যে মনোরমা প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত বার, সহস্র সহস্র বার মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন, এখন মৃত্যু সাক্ষাৎ দেখে, মনের আর সে ভাব নাই। লোকে কষ্ট পাইলে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকে; কিন্তু মৃত্যু যদি সেই সময় তাহার কথানুসারে সেখানে উপস্থিত হয়, তবে আর সে কামনা, সে ইচ্ছা, সে ভাব থাকে না। মৃত্যুর চেহারা দেখে তা'র দিব্যজ্ঞান হয়। হাজার দুঃখ পাইলেও এই দুঃখময় সংসার ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। সংসারের কেমন মায়া, কেমন ভেল্কী, লোকে শত সহস্র কষ্ট পেয়েও শত সহস্র যন্ত্রণা পেয়েও আবার এই পোড়া সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে। লোকে মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন? ভয় করলে কি মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সংসার মৃত্যুর অধীন। প্রাণী সকল মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন ক'রে আছে। যে মৃত্যু, সৃষ্টিস্থিতির প্রারম্ভেই সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মৃত্যুর হাত হইতে এ পর্য্যন্ত কেহই নিস্তার পায় নাই। মৃত্যু সকলেরই সমান আত্মীয়—সে কাহাকেও ঘৃণা করে না—সকলকে সমান আদরে কোলে নিয়া থাকে। কি রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি রোগী, কি সুস্থ, কি স্বরূপ, কি কুরূপ সকলেরই সঙ্গে সমান ব্যবহার, সমান আদর, সমান দৃষ্টি। মৃত্যুর ন্যায় অপক্ষপাত ব্যবহার সংসারে আর কাহারও নাই। মৃত্যু আছে বলিয়া জগৎ সংসার স্থির আছে। মৃত্যু সুখের, আনন্দের ও শান্তির আকর। রোগীর রোগযন্ত্রণা, বৃদ্ধের অশক্ততা, শোকার্ত্তের শোকনিবারণ মৃত্যু ভিন্ন কে করিতে পারে? মৃত্যুই ইহসংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা, সকল মায়া হইতে দূরে লইয়া যায়। কোথায় নিয়ে যায়, কেন নিয়ে যায়,

তাহা কেহই জানে না ব'লেই বুঝি মরণে লোকের এত ভয়? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগে মৃত্যু প্রাণী সকলকে বন্ধন ক'রে নিয়ে যাচ্চে—যেখানে পূর্ব্বপুরুষ, আত্মীয় স্বজন, শত্রু, মিত্র, হৃদয়ের ধন পুত্র, হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামী, প্রাণের আরামদায়ী পিতামাতা, অথবা সংসারের আনন্দরাশি স্ত্রী প্রভৃতি চিরকাল—অনন্তকাল যে যেখানে যায়, যে যেখানে থাকে, মৃত্যু সেই দেশের নিয়ন্তা। সেই মৃত্যুর জন্য প্রাণ এত কাঁদে কেন? মৃত্যু নানা প্রকার আকার ধারণ ক'রে সংসারে বিচরণ করে। সেই এক একটি আকার দেখে লোকের ত্রাস হয়, হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়, শরীরের হাড় কাঁপিতে থাকে, দৃষ্টিশক্তি অন্ধকার হয়, চারিদিক্ শূন্য দেখায়, সেই জন্য এত আশঙ্কা।"

"এই যে, মৃত্যু ভয়ানক ঝড়ের চেহারা ধ'রে নদীগর্ভে উপস্থিত হ'য়েছে, এ ভাব দেখ্‌লে কার না মন কম্পিত হয়? পাঠক! যদি কখন এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন একে রাত্রিকাল, চারিদিক অন্ধকার, ভয়ানক জল ঝড় শিল, এক একটি ঢেউ উঠে নৌকা ডুবু ডুবু কচ্চে, চারিদিকে মৃত্যু বিকট মুখে বিভীষিকা দেখাচ্চে; আর সেই অবস্থায় নৌকামধ্যে প্রাণের পুতুল, ইহ জীবনের জুড়াবার স্থল, হৃদয়ের রক্ত, নয়নের তারা, সংসার কাননের সুখ, বসন্তের প্রাণের পোষা পাখী অষ্টাদশ বর্ষীয়া রমণী থাকলে তা'র মুখ দেখ্‌লে, তা'র ঐ উদাস চোকে, উদাস দৃষ্টি ঐ ভিন্নভাব, ঐ কাতর চেহারা, ঐ মর্ম্মভেদী চঞ্চলতা দেখ্‌লে কা'র না বুক ভেঙ্গে যায়? কা'র না প্রাণের মধ্যে অব্যক্ত আঘাত লাগে? কা'র না শরীরের হাড়গুলি খসে পড়ে? সমুদায় আশা ভরসা, সমুদায় আমোদ প্রমোদ, সমুদায় সুখ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হ'বে। প্রাণের প্রতিমা, সংসারের আলো, জীবনের সুখতারা, শরীরের বল, হৃদয়ের রক্ত, বিস্ময় সংসারের অমৃত, তাহাকে জন্মের মত, চিরদিনের মত এই গঙ্গা গর্ভে, এই দুস্তর, জল রাশিতে বিসর্জ্জন দিতে হ'বে? উঃ! ভাব্‌লে শরীর অসাড় হয়! এই

ঘোর অবস্থায় যিনি পড়েছেন—তিনিই সেই অবস্থানুভাব, সেই অবস্থার যাতনা, সেই অবস্থার মর্ম্মবেদনা বুঝ্‌তে পারেন।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নৌকাস্থ লোক দিগকে আর অধিক-ক্ষণ এই অবস্থায় থাকিতে হইল না। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে লাগিল। একে একে নক্ষত্ররাজি গগণপটে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এখন আর বায়ুর প্রবল গতি নাই, সে জল ঝড় তুফান কিছুই নাই, প্রকৃতিদেবী উগ্রমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভাগিরথী আবার কল্ কল্ নাদে প্রেমসঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আবার সবই মধুময়।

নৌকা হইতে দুইটী রমণী ও একটী যুবক বহির্গত হইলেন। পাঠক! এই দুইটী রমণী কে ও যুবক কে, অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? ইঁহারা আপনার পরিচিত কুসুমকুমারীর সই হেমপ্রভা, অমরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণী মনোরমা ও সুরেন্দ্রনাথ।

মনোরমা শারিরীক অসুস্থ নিবন্ধন হেতু বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে প্রয়াগ-তীর্থে গমন করিয়া ছিলেন। সঙ্গে হেমপ্রভা ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এখানে এক সন্ন্যাসীর মুখে কুসুমকুমারী ও নলিনীকান্তের অনুসন্ধানবার্ত্তা পাইয়া তাঁহারা সকলে নৌকাযানে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা যে, গৃহে পৌছিয়া মনোরমা ও হেমপ্রভাকে রাখিয়া তিনি পুনরায় অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। কিন্তু হেমপ্রভা ও মনোরমা আর তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। একমাস ধরিয়া তাঁহারা নৌকা করিয়া আসিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে পথে কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই। গৃহের অতি সন্নিকটেই এক অনতিউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটে তাঁহাদের নৌকা প্রায় জলমগ্ন হইতে ছিল। সেই করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহারা রক্ষা পাইয়া ছিলেন।

নৌকা হইতে তীরে নামিয়া তাঁহারা কোন পথে যাইবেন, সেই চিন্তায় সকলেই একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এ দিকে দিবাও প্রায় অবসান হইয়াছে। দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। একে ঘোর তামসীময়ী নিশা, বিকটাকার ধারণ করিয়া আলোককে গ্রাস করিতে আসিতেছে; আবার সঙ্গে দুই দুইটী রমণী, তাহে সম্মুখে নিবিড় অরণ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী।

সুরেন্দ্রনাথ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। ক্রমে অন্ধকার সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জ একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতবাসীরা ও অরণ্যবাসীরা স্ব স্ব কুটীরে দীপ জ্বালিতে লাগিল। অনতিদূরে একটী দীপালোকের নিষ্প্রভ আলো, তাহাদিগের নেত্রপথের পথিক হইল। তাঁহারাও আশ্রম পাইয়াছেন ভাবিয়া, মনে মনে একটু হর্ষযুক্ত হইলেন।

ক্রমে সেই দীপালোক নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। অদূরে এক যোগমায়া একখণ্ড শিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করতঃ সেই গহনবন বিদীর্ণ করিয়া গাহিতেছে।

এখন কি করিব হায়।
কে আছে ব্যথার ব্যথী বলে দেয় উপায়।
পুরুষ পরশ জ্ঞানে, মজিলাম তার কথা শুনে
না জেনে না ভেবে মনে, ঘটালাম দায়।
গঞ্জনা লাঞ্ছনার ভয়ে, মাতা পিতা ত্যাগ করে
শেষে এই অকুল পাথারে, বুঝি প্রাণ যায়।
উহু উহু মরি প্রাণে, বিষসম বাজে প্রাণে
তারির কথা পড়ে মনে, কব আমি কায়।
পুরুষেরি বাক্য শুনে, কেউ যেন না মজে প্রাণে
আমার এই দুর্দ্দশা জেনে, বিপদ না ঘটায়।

যোগমায়া আপন মনেই গাহিতেছে। আর তাঁর চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুপাত হইতেছে। সকলেই তাহার এই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যোগমায়ার দৃষ্টি কোন দিকে নাই। কেবল ঊর্দ্ধনয়নে আকাশের প্রতি চাহিয়া গাহিতেছে আর রোদন করিতেছে। তাহার দুই একটি অপ্রলাপ বাক্য শুনিয়া সকলেই তাহাকে পাগলিনী বলিয়া মনে করিল। পাগলিনী কখনও হাসিতেছে কখনও গাহিতেছে কখনও আপন মনে কি বকিতেছে। ক্রমে পাগলিনীর দৃষ্টি আগন্তুকদিগের উপর পড়িল। সকলেই অবাক, নিষ্পন্দ।

পাঠক! এ পাগলিনী আর কেউ নয়; আপনাদের পরিচিত শরৎকুমারী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কে তুমি শিখরবাসিনী?

স্বজনীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে কুসুমকুমারী সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বজনীর এ দুর্দ্দশা, কে করিল, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বজনীর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কে করিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। স্বজনী কি স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করিল? কে তাহাকে এতাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করিল? কে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ দিল? কে তাহাকে অক্ষয় নরক মধ্যে বাস করিতে উপদেশ দিল? কুসুম একাগ্র মনে স্বজনীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার নয়ন নিষ্পন্দ, মুখে বাক্‌শক্তি নাই—একেবারে অচল। তাঁহার আর অন্য দিকে দৃষ্টি নাই, অন্য দিকে

লক্ষ্য নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য ভাবনা নাই, অন্য কিছুই নাই। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, অবাক্ হইয়া কেবল স্বজনীর সেই বিসদৃশ যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন—কেবল তাহার সেই নিজকৃত পাপের অনুতাপসূচক বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন—কেবল তাহার সেই দাবানলসম হৃদয়মন্দিরের অসহ্য মর্ম্মবেদনার প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন। আর তাঁহার সে কঠিন মন নাই, সে উগ্রমূর্ত্তি নাই, সে রোষকষায়িত-লোচন নাই—সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এখন শান্তমূর্ত্তি হইয়াছে। হাজার শক্রই হউক না কেন, কে এসময়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কাহার মন এই ভীতিপ্রদ দৃশ্যপট দেখিয়া সুস্থির থাকিতে পারে? তাহার মনের বিকার দূরীভূত হইয়াছে—তাঁহার হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইয়াছে—তাঁহার মনোমধ্যে পরোপকার ব্রত জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার ন্যায় আর এক অভাগিনীকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন রাখিয়া, সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া, তাহার দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মৃত্তিকা কলস হইতে সুশীতল বারি লইয়া স্বজনীর সেবা করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বজনীর সেই রক্তাক্ত কলেবর ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় উরুদেশে ন্যস্ত করিলেন। হৃদয়ের সেই ভীষণ আঘাতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অল্পে অল্পে সুশীতল বারি দ্বারা ক্ষতস্থল ধৌত করিতে লাগিলেন, ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা সেই ক্ষতস্থান বন্ধন করিতে লাগিলেন, কখনও বা স্বীয় কোমল করে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বজনী হতচেতনা হইয়া পড়িয়া আছে। স্বজনীর মুখে আর কথা নাই, স্বজনীর আর হস্তপদাদির সঞ্চালন নাই, স্বজনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, নিশ্চল, নিস্পন্দ। স্বজনীর ঈদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার কোমল মন ব্যথিত হইল। হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অশ্রুচ্চৈঃ-

স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, স্বজনীর সহায়, সম্পদ, গর্ব্ব, অহঙ্কার এক্ষণে কোথায় রহিল। কোথায় তাহার বিপুল অর্থরাশি থাকিল? কে তাহার সেই বিপুল অর্থরাশির উত্তরাধিকারী হইবে? চিকিৎসা বিনা তাহার দেহ অকালে বিসর্জ্জন হইল? শুশ্রূষা বিনা তাহার বিঘোরে প্রাণ গেল? সামান্য রমণীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব ধ্বংশ করিল! সেই মূর্ত্তিমতী সরলা কুসুমকুমারী ক্ষণকালের জন্যও তাহার কাছছাড়া হন না। সাধ্যানুসারে তাহার সেবা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। একাকিনী অসহায়া রমণী আর কি করিতে পারে? রমণী সাধ্যে যতদূর সম্ভব, তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। তাঁহার যতদূর সাধ্য ততদূর করিতেছেন। কে তাঁহার এই পরোপকার মহৎ-ব্রতে সহায়তা করে?

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইল। রাতদিন, চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব পালানুযায়ী ঈশ্বরের নিযুক্ত পাহারাওয়ালার মত এক একবার বদল হইতে লাগিল। নাগর-দোলার মত এক একবার ঘুরিয়া গেল, আবার এক একবার ফিরিয়া আসিল।

এই একমাসের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে ও হইয়াছে তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? যে কুসুমকুমারী ইতিপূর্ব্বে এই অন্ধকারময় নির্জ্জন পুরীতে একাকিনী অসহায়িনা অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, যে কুসুমকুমারী স্বীয় প্রকোষ্ঠ ভিন্ন এই দুই বৎসর কাল আলোর মুখ দর্শন করিতে পান নাই, আজ সে কুসুমকুমারী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন।

কুসুমকুমারী এক্ষণে এই অন্ধকূপ হইতে পর্ব্বতগহ্বরে যাইবার অপরূপ সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়াছেন। প্রত্যহ অবসর পাইলে দুই তিনবার পর্ব্বত-গহ্বরে যাইয়া, শিখরবাসীদিগের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ পরিদর্শন করেন; আবার এদিকে স্বজনীকান্তের‌ও সেবাশুশ্রূষা করেন। এক্ষণে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, "কোন্ মুখে আর বাড়ী ফিরে যা'ব;

কোন্ মুখে আর লোকালয়ে এ কলঙ্কিত মুখ দেখাব।" তাঁহার মনে এক্ষণে স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, পর্ব্বতবাসীরা ও অরণ্যবাসীরাই প্রকৃত সুখী। ইঁহাদিগের ন্যায় আমিও এই পথালম্বন করি। ইঁহাদিগের ন্যায় আমিও ঈশ্বর আরাধনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, পরকালের কাজ করি! যদি আমি কখনও মহেশ্বরের পূজা ক'রে থাকি, যদি আমি কখনও একাগ্রমনে তাঁর ধ্যান ক'রে থাকি, যদি আমি কখনও নলিনী-কান্তের চরণ সার ভাবিয়া থাকি; তা'হ'লে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদন আমার লজ্জা নিবারণ ক'র্‌বেন। তিনিই আমার মুখ রক্ষা ক'র্‌বেন। যদি আমি জনসমাজে কলঙ্কিত বলিয়া পরিচিত হই, তা'হ'লে আর কেউ তাঁকে দয়াময় বল্‌বে না। তা'হ'লে আর কেউ সেই হরির চরণ সার ভাব্‌বে না। তা'হ'লে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক পড়্‌বে।

কুসুমকুমারী প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এই পর্ব্বতগহ্বরস্থ মহেশ্বরমন্দিরে আসিয়া স্বীয় চিত্তবিকারের প্রতীকারার্থে কখনও বা ঈশ্বর আরাধনা করেন, কখনও বা মহেশ্বরদেবের উপাসক রঘুবর-স্বামীর সহিত শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মালোচনা করেন।

পাঠক! আমাদের কুসুমকুমারী এই রঘুবরস্বামীকে স্বামিজী বলিয় ডাকেন।

স্বামিজী কুসুমকুমারীর প্রমুখাৎ তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমার প্রিয় শিষ্য নলিনী-কান্ত, ইঁহারই প্রেমে পাগল, ইঁহারই জন্য সংসার ত্যাগ করেছেন, ইঁহারই জন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন। অতএব ইঁহাদের শুভ সম্মিলন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মা! আমার একটি প্রিয় শিষ্য আছে, তিনিও এক রমনীর প্রেমে হতাশ্বাস হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। যদি সেই সন্ন্যাসী আপনার হৃদয়েশ্বর হন, তাহা হইলে আগামী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া আপনার নিকট আসিব।" এই বলিয়া সেই নবীন

সন্ন্যাসীর রূপ, গুণ সমুদায় বর্ণন করিলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুমকুমারীর আর সে শ্রী নাই, সে বেশভূষা নাই, সে রমণীয়তা নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, সে অলঙ্কারপ্রিয়তা নাই। তাহার পরিবর্ত্তে সেই রমণীয় কোমলাঙ্গে বিভূতিরাশি ম্রক্ষণ করিয়াছেন। অঙ্গের সে শোভার পরিবর্ত্তে আর এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ মুখশোভা, যেরূপ সহাস্যবদন ছিল, এখন আর একরূপ ধারণ করিয়াছে। এখন গাম্ভীর্য্যে সমুদায় বদন পরিপূর্ণ। মিষ্টবাক্য সদাই অবলম্বন। সদাই ঐশ্বরিক চিন্তায় নিমগ্ন। এখন আর অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানা প্রকার সুখাদ্য রসনাতৃপ্তিকারক বিবিধ মিষ্টান্ন তাদৃশ প্রীতিপ্রদান করিতে পারে না। সেই সমুদায় খাদ্যের পরিবর্ত্তে এখন বন্যফল, বন্য মূল তাঁহার আহ্লাদের, তাঁহার সুখের আহার। যে সুখসেব্য দুগ্ধফেনানিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে কষ্ট অনুভব করিতেন, আজ এই অন্ধকূপময় নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরস্থ মহেশ্বর মন্দিরের মৃত্তিকাতে সুখে শয়ন করিয়া আছেন; অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন।

পাঠক! এই মহেশ্বর-মন্দিরটি অতি প্রাচীনকালের নির্ম্মিত। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কত রাজবিদ্রোহ, কত রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছে, যবনদিগের অত্যাচারে কত শত দেবালয় উৎপাটিত হইয়াছে; কিন্তু এত অত্যাচারের মধ্যেও এই মন্দিরটি অক্ষুণ্ণ ভাবে আছে। মন্দিরের মধ্যে মহেশ্বরের পাষাণময় প্রতিমা বিরাজিত। মন্দির মধ্যে আদৌ আলোক প্রবিষ্ট হয় না। মধ্যাহ্নকালীন রবিতাপেও এই মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইলে দীপ জ্বালিতে হয়। অন্ধকারময় কারাগার মধ্যে কয়েদীরা যেরূপ অবস্থায় থাকে, এই মন্দির মধ্যে মহেশ্বরও চব্বিশ ঘণ্টা সেইরূপ আটক আছেন। পাথরের গঠন বলিয়া

নিস্তার—নচেৎ প্রাণী হইলে দুই দণ্ডকাল তাহার মধ্যে অবস্থান করা অতি দুরূহ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। কুসুমকুমারী অপরূপ বেশে, অপরূপ সাজে সাজিয়া, আজ মহেশ্বরদেবের আরাধনায় নিযুক্তা। এখন আর কুসুমকুমারীর প্রতি অবলোকন করিলে সে কুসুমকুমারী বলিয়া অনুমান হয় না। এখন তিনি নবীন যোগিনী বা নবীন সন্ন্যাসিনী কি শিখর-বাসিনী তাহা ঠিক করা অতি দুরূহ। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি, বেশ ভূষা, চাল চলন প্রকৃত শিখরবাসীদিগের মত। সুতরাং আমাদিগের কুসুমকুমারী এখন যেন যথার্থই শিখরবাসিনী।

পাঠক! এখন হইতে আমরা কুসুমকুমারীকে শিখরবাসিনী বলিয়া অভিহিত করিব। শিখরবাসিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্না আছেন। তাঁহার একমাত্র চিন্তাই বল, একমাত্র ধ্যানই বল—সেই নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত কোথায় আছেন, কিরূপ ভাবে আছেন, এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল। তিনি কি, আমার মতন যোগীবেশে, সন্ন্যাসীবেশে, দেশে দেশে, নগরে নগরে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গহ্বরে গহ্বরে অবস্থান করিতেছেন? হয় ত, তিনি নিশ্চয় আমার অনুসন্ধানে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত যত্ন করিতেছেন। নয়ত, আমার আশয়ে হতাশ্বাস হইয়া অপর কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন।

না! তিনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, যদি দারপরিগ্রহ করেন ত আমাকেই করিবেন। নচেৎ চিরকাল অবিবাহিত থাকি-বেন। তাঁহার কি এখনও সেইরূপ মানসিক ভাব আছে? এখনও কি তিনি এ হতভাগিনীকে স্মরণ করেন? হা বিধাতঃ! একটিবার কি আর আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব না? একটিবার কি আমাদিগের চারি চক্ষের সম্মিলন ঘটিবে না! হা ঈশ্বর! আমার প্রতি কি তুমি এতই নিষ্ঠুর! অভাগিনী তোমাকে দিবারাত্র কায়-মনোবাক্যে ডাকিতেছে, অভাগিনীর কথায় কি একটিবারও কর্ণপাত

করিবে না। দয়াময়! তোমার ইচ্ছাই সুসিদ্ধ হউক। অভাগিনীর শেষ প্রার্থনা যেন অগ্রাহ্য করো না। প্রাণান্তের পূর্ব্বে যেন একটি-বার তাঁহার পাদপদ্ম দেখিতে পাই। আমি আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না, আর কিছুরই প্রার্থনা করি না।

শিখরবাসিনী আপন চিন্তার্ণবে নিযুক্তা। এমন সময় পর্ব্বতের অপরপার্শ্ব হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "ভগ্নি। তোমার দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে। তোমার মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। তুমি সতী, সতীর ঐকান্তিক প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না। ভয় নাই, আর কিছু-কাল অপেক্ষা কর। শীঘ্রই তোমাদিগের শুভ সম্মিলন হইবে।"

কাহার এই স্বর? কে আমাকে ছলনা করিল? কে আমাকে প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করিল? এ যে পরিচিত স্বর বলিয়া বোধ হইতেছে।

আবার সেইস্বর বজ্রগম্ভীর স্বরে গাহিতে লাগিল,—

জ্বল্ জ্বল্ হিয়া দাবানল সম,
হৃদয়ে যন্ত্রণা বাড়ুক বাড়ুক;
হউক পাপের প্রতিফল মম,
জ্বলুক্ জ্বলুক্ পুড়ুক্ পুড়ুক্।
দেখ্ রে স্বজনী দেখ্ না আসিয়ে,
হৃদয়ে জ্বলিছে যে জ্বালা আমার,
সান্ত্বনা প্রদানে আর কে নিবারে
তোমা বিনা আর আছে কে আমার?
এলিনি পামর, দেখ্ লিনি চেয়ে,
মজালি অবলা সরলা কামিনী,
জ্বলিছে কি জ্বালা দেখ্ না রে এসে,
কহিতে না পারে কুলের রমণী

দিবানিশি আমি হতেছি দাহন,
নাশিয়ে নারীর অমূল্য রতন,
সতীত্বের সম নাহি কিছু ধন,
আছে কি ভুবনে বলনা এমন।
দেখ রে মানব দেখনারে চেয়ে,
দেখ দেবগণ এখানে আসিয়ে;
চরাচরবাসী রাখহ জানিয়ে,
পাপের প্রতিফল ভুগ্‌তেই হবে।
ধন্য সতী লক্ষ্মী বঙ্গকুলনারী,
রাখিছেন যিনি পবিত্র করিয়ে,
রমণীর সার সতীত্ব রতন,
পূজবে সকলে তাহারে হেরিয়ে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ পুনর্ম্মিলন।

স্বজনীর ক্ষতস্থল এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। স্বজনীর মনে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, স্ত্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়াছে; তাই আজ শয্যায় শুইয়া আপন মনে বলিতেছেন, "স্ত্রীজাতির চরিত্র বুঝা মানবের কথা দূরে থাকুক, দেবতারা পর্য্যন্তও অবগত নহেন। ইহাদিগের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। জগতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই, এমন কোন ভীষণ কার্য্য নাই, যাহা স্ত্রীজাতি দ্বারা সম্পাদিত না হয়। লজ্জা, ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জা পায়। ইহারা ঘোর অবিশ্বাসিনী, অগ্রে বিশ্বাসকে হনন করিয়া

পরে অন্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, মায়াকান্না, ইহাদিগের চিরসহচর। ছল বল, কল কৌশল ইহাদিগের অঙ্গভূষণ। ইহারা কালভুজঙ্গিনী অপেক্ষাও প্রতাপশালিনী। যেরূপ ব্যাধের বংশীধ্বনি শ্রবণে হরিণ হরিণীগণ বিমুগ্ধ হয়, তদ্রূপ ইহাদিগের অমৃতময় মধুরবাণী শ্রবণে মানবগণ বিমুগ্ধ হয়। এই নারকী জাতি, এই পাতকী জাতি, কিছুমাত্র আচার বিচার, সম্ভ্রমবিচার করে না। মুখে যাহাকে ঘৃণা করে, উপহাস করে, হৃদয়ে তাহাকেই স্থান দেয়। মুখে যাহাকে ভালবাসে, মুখে যাহাকে সোহাগ দেখায়, মুখে যাহাকে প্রশংসা করে, হৃদয়ে তাহাকে ঘোর শত্রু বলিয়া ভাবে, সে চলিয়া যাইলে পরম প্রীতিলাভ করে। ইহারা একপক্ষে কুসুমাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়, আবার পরোক্ষে উপপতির চর্ম্মপাদুকা প্রহারেও কাতর হয় না। ইহারা ছায়া দেখিলে ভয় পায়; কিন্তু আশা পূরণে তমোময়ী যামিনীই ইহাদিগের প্রিয়সঙ্গিনী, ইহাদিগের অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত সময়। ইহাদিগের মুখে মধু, কিন্তু অন্তরে বিষ। ইহারা লোকের নিকট সতী, লক্ষ্মী, পতিব্রতা, সরলা বলিয়া পরিচয় দেয়; আবার অন্তরে দারুণ কুটীলা, ঘোর নারকী অপেক্ষা ঘৃণার পাত্রী। ইহারা স্বামী সমক্ষে পরম সতী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, আবার তাহার মনের গতিপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাকে সংহার করিতে কিছুমাত্র ভীতা হয় না। সংসারে এমন কোন বন্ধনই নাই, এমন কোন ভীষণ কার্য্য নাই যে, ইহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে না পারে? বীরপুরুষেরা যে যে কার্য্য করিতে শঙ্কিত হয়, ইহারা সেই কার্য্য নিমেষ মধ্যে, কটাক্ষ্য মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে। ঘোর নারকী যে কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে, সে কার্য্য ইহাদিগের চির অভ্যস্ত। যাহারা ইহাদিগের বশীভূত হয়, তাহাদিগের ন্যায় ঘোর মূর্খ আর কে আছে? যাহারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের ন্যায় ঘোর নির্ব্বোধ আর কে আছে? যাহারা ইহাদিগের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া তৎকার্য্য সাধনে সচেষ্ট হয়,

তাহাদিগের ন্যায় অসার আর কে আছে? স্ত্রী যাহার দেবতা, স্ত্রী যাহার উপাস্য, স্ত্রী যাহার সর্ব্বস্ব সে ঘোর নারকী। রমনীগণ স্বার্থ ভিন্ন কোন কার্য্য করে না। ইহারা আত্মসুখ অভিলাষে সকল ঘৃণাকর, লজ্জাকর কার্য্য সমাদরে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। সংসার ইহাদিগের ক্রীড়াভূমি। ক্রীড়ার পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই; খাদ্যের দোষ গুণ বিচার করে না। অধিক কি এক কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ কার্য্য আছে, তাহা এক দিকে এবং এই কুলটাদিগকে এক দিকে রাখিয়া ওজন করিয়া দেখিলে কুলটারাই গুরুত্বে প্রধানা হয়।”

কখনও বলিতেছেন, “আমার অসময় দেখিয়া কেষ্টা বেটা পর্য্যন্তও পলায়ন করিয়াছে। আমার অর্থ সামর্থ্য কিছু না থাকাতেই তার এই আচরণ। এখন আমি বেস জানতে পাল্লুম, যত দিন লোকের ধন থাকে, তত দিন সকলেই আপনার হয়। অসময় প'ড়লে আর কেউ ফিরে চায় না। উঃ! মানব কি স্বার্থপর! এক অর্থেই আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! এক কুসংসর্গেই আমায় উৎসন্ন দিলে! সাবধান! কেউ যেন ধনমদে মত্ত হয়ে, আমার ন্যায় আর অসৎপথে বিচরণ না করে। কেউ যেন আর কুসংসর্গে মিশে আপনার চরিত্রকে দূষিত না করে।”

“শিখরবাসিনীর আজ চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। শিখরবাসিনী আজ মহেশ্বর মন্দিরের নিকটে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? তাঁহার মুখ আজ চিন্তারেখায় অঙ্কিত, নয়ন দুইটী মুদ্রিত, যেন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। সংসারে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিবার স্থান না দেখিয়া, যেন হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে না, এমন লোক পৃথিবীতে কে আছে? যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া, মায়া মোহের বন্ধন মুক্ত করিয়া, স্বদেশ, আত্মীয় স্বজনের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয় হইতে পুঁছিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার আবার

সংসারের প্রীতি চিন্তা কি? কিন্তু পাঠক! আজ যদি আপনাকে মহেশ্বর মন্দিরের নিকটে লইয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখাইতাম, যোগী বল, ঋষি বল, উদাসিনী বল, সংসারে থেকে কেউ সংসার ত্যাগ কর্‌তে পারে না। মধ্যাকর্ষণ যেমন জগতের প্রত্যেক পদার্থকে প্রত্যেক পরমাণুকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, সংসারও সেইরূপ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এই মাধ্যাকর্ষণবলে মেঘরাশি হইতে জলবিন্দু পতিত হয়—আবার ঐ দেখ, সাংসারিক আকর্ষণবলে শিখরবাসিনীর চক্ষু হইতে বড় বড় মুক্তাফলকের ন্যায় এক এক বিন্দু জল গণ্ডস্থলে এসে ক্রমে ক্রমে বক্ষঃস্থলে পতিত হইতেছে। শিখরবাসিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নিশার শিশিরপূর্ণ কমলদলের ন্যায় চক্ষু দুইটী জলে টল্ টল্ করিতে লাগিল। রক্তিম গণ্ডস্থল গোলাপদলের ন্যায়, লাল মুক্তায় সূর্য্যের আভা পতিতের ন্যায়, আরও লাল হইয়া উঠিল। চিন্তার বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তাইত! অনেকদিন হ'লো স্বামিজীর কোন খবর পাওয়া গেল না? তিনি যে এক নবীন সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে করিয়া আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইযা গেলেন, কই! আজও ত ফিরিয়া আসিলেন না? সেই নবীন সন্ন্যাসীর যেরূপ আকৃতি, গঠন ও তাঁহার যেরূপ স্বভাব চরিত্রের বিষয় বলিলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সেই নবীন যুবক সন্ন্যাসীই আমার হৃদযের নলিনীকান্ত। আমার হৃদয়েশ্বর কি আজও জীবিত আছেন? আমার জীবিতেশ্বর কি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি সন্ন্যাসী হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হইয়া, তিনি যোগী হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে যোগিনী সাজিয়া, তিনি উদাসী হইলে আমিও উদাসিনী হইয়া, তিনি শিখরবাসী হইলে আমিও তাঁহার সঙ্গে শিখরবাসিনী হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গহ্বরে গহ্বরে বাস করিব

"আমিও যেমন দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করে তাঁর কিছুই অনুসন্ধান কত্তে পাচ্চি না, তিনিও কি আমার মতন নিরাশ হইয়াছেন? আর কত-কাল এরূপ অবস্থায় থাকতে হবে? আশা-মরীচিকায় আর কতদিন প্রতারিত হব? বিধাতা সংসারকে সুখের পদার্থ দিয়া সাজাইতে ক্রটী করেন নাই। যাহার যে পদার্থে সুখ, তাহারই জন্য সেই পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। রাত্রি হইলে চন্দ্রদেব হাসিতে থাকে, পৃথিবীকে হাসায়, কুমুদিনীও সেই হাসিতে যোগদিয়া প্রাণভরিয়া হাসিতে থাকে। তবে, আমি হাসি না কেন? সূর্য্য উদয় হইলে সকল অন্ধকার ঘুচে যায়, কিন্তু কৈ আমার ত হৃদয়ের অন্ধকার গেল না? এখন চন্দ্র পৃথিবীকে হাসাইতে পারে; কিন্তু আমার হৃদয়কে ত হাসাইতে পারে না? সূর্য্য জগতের অন্ধকার নষ্ট করতে পারে; কিন্তু আমার প্রাণের অন্ধকার ঘুচাতে পারে না?"

"যা হোক্, স্বামিজী বলিয়াছেন যে, আগামী পূর্ণিমা তিথির মধ্যে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়া-ছেন, আমার দুঃখের রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হ'বে। যখন এতদিন গেল, এইবার আগামী পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর্‌ব। ইষ্টদেব অবশ্যই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।"

"এইরূপ চিন্তা কত্তে কত্তে পুনর্ব্বার তাঁহার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করে এল। নীলোৎপলে আবার শিশির সঞ্চার হলো। বড় বড় মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু আবার গণ্ডস্থলের উপর দিয়া গড়াতে গড়াতে পৃথিবী চুম্বন কত্তে লাগ্‌লো। দুঃখের জোয়ার উথ্‌লে উঠ্‌লো। শিখরবাসিনীর মুখকমল করকমলের উপর স্থাপিত হলো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুল্লতা প্রকাশের ন্যায়, আশা কুহকিনী প্রকাশ হয়ে শিখরবাসিনীর হৃদয়ের ভার লঘিত কল্লে। তমসাকুল তড়াগ স্থিরভাবে, পরিণত হলো, তাঁহার মনের দুঃখ, মনের কথা, মনের আগুন মনেতেই মিশে গেল।"

"আজ শিখরবাসিনী যে কি ভাবে কি চিন্তায় নিমগ্ন আছেন,তাহার মর্ম্ম ভেদ করে কার সাধ্য? নারীর হৃদয় অনন্ত, অতলস্পর্শ, গভীরতা সীমা পরিমাণ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বে সমুদ্র, পৃথিবী, নদ, নদী সকল যেমন স্থিরভাবে, স্তম্ভিতভাবে নিস্তব্ধ থাকে; সেইরূপ নারীহৃদয় কোন প্রবল চিন্তার ঝড় হওয়ার পূর্ব্বে স্থির, শান্ত নিস্তব্ধ থাকে। মনুষ্যের চিন্তা নানা প্রকার! কোন কোন চিন্তা বিষের ন্যায় জীবন জর্জ্জরিত করে, ক্ষণকাল মধ্যে চেতনা হরণ করে, মানুষকে নূতন ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। আবার কোন কোন চিন্তা যদিও কষ্টকর, যাতনাদায়ক, কিন্তু তা'র মধ্যে সুখের ছবি দেখা যায়। সেই কষ্টমিশ্রিত চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ কব্‌তে ইচ্ছা করে। বাহ্যজগতের সহিত অন্তর জগতের অতি নিকট সম্বন্ধ। বাহিরে যা' ঘটে, অন্তরেও তাই সর্ব্বদা হচ্চে। যেমন আকাশে এক সময়ে রৌদ্র ও বৃষ্টি হয়, সেইরূপ এক হৃদয় হইতেই এক সময় সুখ, দুঃখ ও চিন্তা প্রকাশ পায়। আজ শিখরবাসিনীর মায়ামোহ-জর্জ্জরিত অন্তঃকরণ এরূপ অভিভূত হলো কেন? তাঁহার হৃদয় আজ কোন সুখের ভিখারিনী? তার হৃদয়ের সুখের ধ্রুবতারা আজ কোন মেঘে ঢাকা পড়েছে?"

"শিখরবাসিনী এক একবার চিন্তায়,দুঃখে, নিরাশায় আক্রান্ত হচ্চেন, আবার মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইতেছে। চিন্তার জোয়ার ভাটা মনে খেলা করিতেছে। কখন মৃত্যু কামনা কচ্চেন,কখন জীবনে কত রকম সুখের ছবি অঙ্কিত করিতেছেন। ছবিখানি নানা রঙ্গে, নানা শোভায়, নানা রকম মূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ করে, ক্ষণকাল পরে আবার তৈয়েরী মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। তিলোত্তমা যেমন স্বীয় কক্ষমধ্যে উপবিষ্টা হইয়া, কাগজে মনের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছিলেন, জনকনন্দিনী সীতাদেবী যেমন অশোককাননে একাকিনী উপবিষ্টা থাকিয়া নানা রকম কল্পনার হার গাঁথিতেছিলেন,

আজ আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তিনী শিখরবাসিনীও সেইরূপ নানা চিন্তা, নানা রকম কল্পনা, নানা প্রকার স্বপ্ন লইয়া বালকের ন্যায, কবির ন্যায ক্রীড়া করিতেছিলেন।”

“সংসারের নিয়ম—সংসারের ঘটনা, সংসারের কার্য্য ভোজবাজীর ন্যায কত রকম মূর্ত্তি ধারণ করে, কত ভাবে উপস্থিত হয়, কে তা’ নির্ণয় করতে পারে? রমণীরত্ন সংসারের সার। যে রত্নের জ্যোতিঃ না থাকিলে সংসার বল, রাজ্য বল, ধন বল, যৌবন বল, রূপ বল সকলই মিথ্যা, সকলই মৃত, সকলই নীরস, সকলই অন্ধকার; আজ সেই রমণীরত্ন উদাসিনী বেশে সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মূর্ত্তিমতী বিষাদ প্রতিমার ন্যায উপবিষ্টা আছেন কেন? তাঁহার ঐ বিশাল চক্ষু, বিষাদ-অশ্রু মোচন করিয়া মহেশ্বর মন্দিরের মৃত্তিকা অভিষেক করিবার জন্য কি বিধাতা এই শিখরবাসিনী বেশে এখানে উপস্থিত করিযাছেন? এত কষ্ট, এত ক্লেশ, এত যাতনা, এত অশ্রুপাত তবুও কি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? এই নবীন বয়স,—কোমল হৃদয়, সংসারের আনন্দ পুত্তলিকা, নূতন প্রস্ফুটিত ইহার উপর পরমেশ্বরের এত বিষদৃষ্টি কেন? যে পুষ্প পরিমলপূর্ণ জগতের আলোক, অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালী, আপন রূপে, আপন সৌন্দর্য্যে ঢল্‌ ঢল কচ্চে, সেই নব প্রস্ফুটিত ফুলটি দগ্ধমরুভূমি মধ্যে পতিত দেখ্‌লে কা’র না হৃদয় ব্যথিত হয়? নির্ম্মল রত্ন মলিন আবরণে আচ্ছন্ন থাক্‌লে পরিষ্কার কর্‌তে কা’র না ইচ্ছা করে?”

“আজ এই শিখরবাসিনীকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রদেবের ন্যায় চিন্তাক্রান্ত দেখে কা’র না মন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হচ্চে? এ সংসার সুখের স্থান কল্পনা মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের যদি বিচার থাকৃত, গুণের যদি পুরস্কার হতো, তা’হ’লে শিখরবাসিনীর চক্ষের জলের সঙ্গে আজ আমাদিগের অশ্রুবিন্দু যোগ দিতে হ’ত না?”

সহসা কাহার পদধ্বনি শ্রবণে শিখরবাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে স্বামিজী দণ্ডায়মান। স্বামিজীর পার্শ্বে আর এক নবীন যুবক অপরূপ বেশে, অপরূপ সাজে, অপরূপ ভূষায় ভূষিত। এই নবীন যুবককে নবীন সন্ন্যাসী সাজিতে দেখিয়া, শিখরবাসিনীর মনে এক অপরূপ ভাবের উদয় হইল। তাঁহার চক্ষু এই অপরূপ রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। তাঁহার সেই বিশাল নয়ন এই নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। তিনি সলজ্জে চক্ষু অবনত করিলেন। তাঁহার চিত্ত আনন্দদোলায় দুলিতে লাগিল। মনে মনে এই নবীন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। এই সন্ন্যাসীর অপরূপ কান্তি দেখিয়া, তাঁহার নলিনীকান্তের কথা মনে পড়িল। দরদরিত অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে নলিনীকান্তের চিন্তায় শিখরবাসিনী চিন্তিত হইতেছিলেন, যে চিন্তা তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিতেছিল, তদপেক্ষা এই নবীন যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ব্যথিত হইতে লাগিলেন। কে আসিয়া বলিয়া দিতে লাগিল, শিখরবাসিনী আতিথ্য সৎকার কর—অতিথিরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, হইয়াছেন, ইহাঁদিগকে সেবা করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর।

শিখরবাসিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তজ্জন্য সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তৎকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামিজী শিখরবাসিনীর এইরূপ চিত্ত-বৈকল্য দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, শিখরবাসিনী নলিনীকান্তকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন; নচেৎ এত তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি অবলোকন করিতেছেন কেন? যাহা হউক, সহজে ইহার পরিচয় প্রদান করিব না। অগ্রে ইহাদের চিত্ত পরীক্ষা করি। ইহাদিগের আর সংসারাশ্রমে বাস করিতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে কিনা? কিম্বা এই নবীন সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসিনী সাজিয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিতে বাসনা আছে কিনা? একে ইঁহাদের বয়সের পরিপক্কতা জন্মে নাই, এখনও ইঁহাদের চিত্তের স্থিরতা নাই। মনের দুর্ব্বলতায়, প্রেমের প্রবলতায়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আহা! এই নবীন বয়সে সংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া কি এই কঠোর ব্রত-পালনে আর সমর্থ হইবেন?

পাঠক! একবার এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি অবলোকন করিয়া দেখুন, ইঁহার নয়ন নিষ্পন্দ; চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। শিখর-বাসিনীর অপরূপ যোগিনীবেশ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন! এখন আর মুখে একটি মাত্র কথা নাই। যাহাকে শয়নে, স্বপনে ধ্যানে, জ্ঞানে, সর্ব্বদাই চিন্তা করেন; আজ সম্মুখে দেখিয়া, সম্মুখে পাইয়া অবাক্। কি বলিবেন কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, স্বামিজীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিলেন, "প্রভো! ইনিই কি শিখরবাসিনী? আহা! এই অসীম রূপরাশি কি ভস্মাবৃত থাকা উচিত! এই কোমলাঙ্গী কি এই কঠোর ব্রতাবলম্বনে নূতন ব্রতী? এখনও শরীরের সৌন্দর্য্য ভস্মা-বৃত বহ্নির ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এখনও ইঁহার চিত্তের শমতা হয় নাই! ইনি কি নবীন সন্ন্যাসিনী, না যৌবনে যোগিনী, না শিখর-বাসিনী! আহা! এই সুকোমল তন্বাঙ্গী কাহার অন্তঃকরণে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দিয়া এই কঠোর ব্রতাবলম্বনে নিযুক্ত হইয়াছেন? এখনও ইঁহার মন সাংসারিক বিষয় কার্য্য হইতে অপসৃত হয় নাই! আহা! ইঁহার পিতা মাতার কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা, কি মনস্তাপ! যাঁহাদিগের এই অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা, ইনি যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিনী তাঁহাদিগের ন্যায় অসুখী কে?

নবীন সন্ন্যাসী অল্পে অল্পে স্বীয় গ্রীবা উন্নত করিয়া, শিখরবাসিনীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি কি কোন বনদেবী? না, কোন মায়াবিনী ছল করিয়া এই কঠোর তপস্বিনী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন? আপনি যে হউন, আপনার এই অল্পবয়সে সংসারের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া ঈদৃশ কঠোর ব্রতে ব্রতী হওয়া কি উচিত?

শিখরবাসিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হৃদয়ের অসহ্য বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহার চিত্তসংযম হয় নাই, সে আবার সন্ন্যাসিনীধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে? যাহার চিত্ত অহরহঃ চিন্তাতে পরিপূর্ণ, যাহার মন এই অপরূপ রূপ ধ্যানে সদাই নিযুক্ত, সে আর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে?

শিখরবাসিনী এই নবীন সন্ন্যাসীর পদযুগল ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, স্বামিন্! প্রভো! এখনও এ দাসীকে চিনিতে পারেন নাই? এখনও এ দাসীর অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন নাই? প্রথম দর্শনেই আপনাকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু আপনার দক্ষিণ হস্তের ঐ যৌতুক দেখিয়াই আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। এ দাসী, যৌবনে যোগিনীও নহে, মায়াবিনীও নহে, কিম্বা শিখরবাসিনীও নহে। এ দাসী তোমারই সেই অভাগিনী কুসুমকুমারী। তোমারই জন্য যৌবনে-যোগিনী সাজিয়াছি, তোমারই জন্য মায়াবিনী হইয়াছি, তোমারই জন্য শিখরবাসিনী হইয়াছি। এ দাসী চিরকালই তোমার। তোমার ঐ মোহন-প্রতিমা হৃদয়ে সতত বিরাজমান—তোমার ঐ মোহনমূর্ত্তি মনে করিয়া, তোমার ঐ চরণ-পদ্ম ধ্যান করিয়া এতাবৎকাল জীবিত আছি। ইচ্ছা হয়, দাসীকে চরণে স্থান দিও, নচেৎ চিরকাল যৌবনে-যোগিনী সাজিয়া, শিখর-বাসিনী হইয়া কাল কাটাইব। শিখরবাসিনী আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না। সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া, নবীন যুবক সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

কুসুমকুমারীর এখনও মূর্চ্ছা অপগত হয় নাই। তাঁহার পার্শ্বে মনোরমা তালবৃন্ত লইয়া বীজন করিতেছেন। হেমপ্রভা সুশীতল বারি লইয়া, অল্পে অল্পে মস্তকে, কখন বা চক্ষে, কখনও বা পদতলে প্রক্ষেপন করিতেছেন। স্বজনীকান্ত যদিও এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য-লাভ করিতে পারে নাই; তথাপি জ্যেষ্ঠের সহিত শুভ সম্মিলন সন্দর্শনার্থে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেও সাধ্যানুসারে সেবা করিতে ত্রুটী করিতেছে না।

নলিনীকান্ত কুসুমকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস-পাত করিতেছেন, আর একদৃষ্টে তাহার মুখ পানে চাহিয়া আছেন। কাহারও মুখে একটিমাত্র বাক্যস্খলন হইতেছে না। সকলেই প্রতি-মুহূর্ত্তে কুসুমকুমারীর মূর্চ্ছা ভঙ্গের আশা প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্পে অল্পে কুসুমকুমারী চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। সকলেরই মুখে আনন্দ-চিহ্ন প্রকাশ পাইল।

কুসুমকুমারী স্বীয় জননী ও প্রাণাধিকা সই হেমপ্রভাকে পার্শ্বে উপ-বিষ্টা ও সেবাশুশ্রূষা করিতে দেখিয়া আহ্লাদে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। পুনরায় নলিনীকান্তের ক্রোড়ে শয়ন করিলেন।

অদূরে কাহার ভীম গর্জ্জন রব গগণ বিদীর্ণ করিয়া বলিতেছে—গেল! গেল! সব গেল! হৃদয় পুড়ে গেল! মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন হলো! কোথায়! কোথায়! স্বজনী কোথায়! একবার দেখ, তোর শরতের দুর্দ্দশা দেখ! তোর প্রাণের শরৎ, পাগলিনী বেশে, উন্মাদিনী বেশে

পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে; কোথাও শান্ত হতে পাচ্চে না। কোথাও হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পাচ্চে না—কোথাও চিত্তের শমতা হচ্চে না। তোর মনস্কামনা পূর্ণ হলো! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো! অভাগিনীর হলো না! হলো না! হলো না।

সকলেই একেবারে স্তম্ভিত, বাক্‌শক্তিহীন, নিস্পন্দ। কোথায় কে চীৎকার করিতেছে। স্বজন আর স্থির থাকিতে পারিল না। একেবারে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শরতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। কেহুই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি বলিয়া, স্বজনী সকলের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আবার সেই শব্দ আরও নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই শব্দ আরও সুস্পষ্টরূপে গগণ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছে—ভাগ্নগণ! প্রাণের সহোদরাগণ! একবার আমার দুর্দ্দশা দেখ! একবার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখ! রমণীর সতীত্ব নষ্ট হলে, তার পরিণাম কি হয়, তার হৃদয়ে কি অসহ্য কষ্ট হয়, একবার দেখে যাও, একবার শিক্ষা করে যাও। আমি অভাগিনী বাল্যবিধবা রমণী যৌবনকালীন দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় পরবশে অসমর্থা হ'য়ে, পুরুষের বাক্যে প্রলোভিত হ'য়ে, ধন, মান, জীবন, যৌবন সব নষ্ট করেছি— মনের সুখ নষ্ট করেছি। আমার লোকালয়ে, আত্মীয় স্বজনের নিকট কলঙ্কিত মুখ দেখাবার ভয়ে, এ পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন কচ্চি।

একবার দেখে যাও—একবার আমার এই দুর্দ্দশা দেখে তোমাদের হৃদয়ে যেন এ দুষ্প্রবৃত্তি না ঘটে, তাই শিক্ষা করে যাও—আমার পাপের কথা শুনে তোমরা এখনও সতর্ক হও— এখনও পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ কর—এখনও স্বধর্ম্ম রক্ষা কর—ধর্ম্মের জয় চিরকাল। অধর্ম্মের কখনও জয় নাই। অধর্ম্ম করিলে একদিন না একদিন ভুগ্‌তেই হ'বে! ভুগ্‌তেই হবে! শেষে অন্তস্তল ছিন্ন ভিন্ন হবে।

ধন্য সতী কুললক্ষ্মী! ধন্য রমণীকুলের আদর্শ! ধন্য কুসুম! তোমায় শত শতবার সহস্র সহস্র বার ধন্যবাদ দিই। তুমি কি কষ্ট না ভোগ করেছ? কি যন্ত্রণা না সহ্য করেছ? কি মনস্তাপ না পেয়েছ? তুমি এত কষ্ট সহ্য করে, এত যন্ত্রণা ভোগ করে যে, তোমার অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করতে পেরেছ—সে কেবল ধর্ম্ম বলেই। তোমার মহৎ দৃষ্টান্ত জগতে ঘোষিত হউক—তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে দেদীপ্যমান থাকুক—তোমার যশসৌরভ চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হউক।

আবার ক্ষণকালের জন্য সেই স্বর নিস্তব্ধ হইল। সকলেই একাগ্র মনে সেই স্বর শ্রবণ করিতে উৎসুক। আবার সেই স্বর বলিতেছে—মা! মা! তোমার স্নেহের শরৎ জন্মের মত বিদায় নিচ্চে! তোমার পাপিয়সী কন্যা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্চে! একবার দেখে যাও! একবার তার দুর্দ্দশার পরিণাম দেখ!

সজনী বসন্তসহকারে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহার প্রাণের শরৎ হলাহল পান করিয়াছে। পাত্রস্থ গরল তখনও কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে। সজনীকে সম্মুখে দেখিয়া শরৎ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—"এসেছ! তবু ভাল! মৃত্যুকালে তোমায় যে দেখ্‌তে পেলুম, ইহাই পরম সৌভাগ্য। আর ত ও মুখ দেখ্‌তে পাব না—আর ত ও মুখের কথা শুনতে পাব না—ইহ জীবনে আমাদের মিলনে সুখ নাই। যদি পরজন্ম থাকে, তা হ'লে যেন তোমাকেই পতীত্বে বরণ করি। এস? আর কেন! এখানে থেকো না! আমার সঙ্গে এস! আমার দৃষ্টান্তানুযায়ী কাজ কর! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পরজন্মে মিলিত হইগে। শুনলে না? আমার কথা গ্রাহ্য করলে না? আচ্ছা! না কর; একবার আমার কাছে এস; একটা কথা বলি। মৃত্যুকালে সেই কথা আর কার কাছে বল্‌বো। আর ত কেহই নিকটে নাই। তুমিই আছ, তোমাকেই বলি। যতক্ষণ না সেই কথা আমার মুখ হ'তে নিসৃত না হচ্চে, ততক্ষণ আমার মরণেও সুখ

নাই। এলেনা। এলেনা।! মরণে ভীত হচ্চ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভয় পাচ্চ? জাননা! মাথার উপর কে আছেন? তিনি সর্ব্বান্তর্যামী! তোমার পাপের পরিসীমা নাই? তোমার বাঁচিতে এত সাধ? আবার কা'র সর্ব্বনাশ করবে? আবার কোন রমণীকে অকূল পাথারে ভাসাবে? না! তা হবে না? তোমার বাঁচিয়া থাকা হবে না? এস! আমার সঙ্গে এস? চল, জুড়াইগে! জুড়াবার স্থান এ পৃথিবী নয়। যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য চিরকাল, অনন্তকাল দেদীপ্যমান, যেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান, চল! সেইখানে যাই। সেই খানেই আমাদের মিলন হবে।

শরৎকুমারী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ও স্বজনীর মৃত্যুতে ভয় দেখিয়া আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিল না। স্বীয় কটিস্থ শানিত ছুরিকা দ্বারা স্বজনীর উভয় হস্তে যুগপৎ আঘাত করিল। হস্ত দুই খানি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

স্বজনী একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পাছে কেহ তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাহায্যার্থে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় ও স্বজনী যদি দৈবক্রমে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ পাপনেত্রে, যে নেত্রে আমায় মজাইয়াছে ঐ নেত্রের সমূলে উচ্ছেদসাধন করি। এই বলিয়া স্বজনীর নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলিল।

স্বজনীর সেই ভীষণ আকৃতি ও রক্তস্রাব দেখিয়া শরৎকুমারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শরতের সে মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল।

স্বজনীর সেই ভীষণ আর্ত্তনাদে গহন বন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার সেই বিলাপসূচক ক্রন্দনধ্বনি সেই স্থানকে প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিল। তাহার যন্ত্রণার অস্থিরতা ও ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে সকলেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বজনীর এই ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া সকলেই একেবারে

স্তম্ভিত। নলিনীকান্ত ভ্রাতার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একেবারে উচৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

পাপপ্রাণ সহজে বহির্গত হইতে চায় না। স্বজনীর এখনও প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় নাই। সে ভ্রাতার চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। নলিনীকান্ত নিকটে গেলে, স্বজনী বলিতে লাগিল, "দাদা! ক্ষমা করুন। কুসুম! ভগ্নি, ক্ষমা কর। তুমি সতী, তুমি লক্ষ্মী! তোমার অভিশাপ হাতে হাতে প্রত্যক্ষ করিলাম। সতীবাক্য লঙ্ঘিবার নয়। দাদা! ভগ্নি কুসুমকুমারীকে বিবাহ করুন। কুসুম, আপনাকে ঐকান্তিক ভক্তি করে, আপনা-কেই ধ্যান করে, আপনাকেই পূজা করে। সতীর আর মনকষ্ট দিবেন না। আর প্রাণান্তেও তাহাকে কাছছাড়া করিবেন না। কুসুমকে অসতী বলিয়া মনে দ্বিধা করিবেন না। কুসুমকে গ্রহণ করুন। কুসুম! দিদি আমার! একবার কাছে এস। তোমার হস্ত ও দাদার হস্ত একত্র কর, আমি একবার শুনি। আমার চক্ষু নাই যে একবার দেখ্‌ব। ঐ পাপিয়সী শরৎ আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছে। ঐ পাপিয়সীই আমাকে মজাইয়াছে—ঐ পাপিয়সী হইতেই আমি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছি। মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, আপনাদিগের শুভসম্মিলন দেখিয়া মরিব; কিন্তু বিধাতা আমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন না। আপনাদিগের দুই হস্ত একত্র হইতে দেখিতে পাইলাম না। আপনা-দিগের শুভ মিলন না হইলে আমার মরণেও সুখ নাই।"

নলিনীকান্ত এ দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বজনীর শেষ অন্তিমকালীন প্রার্থনা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব থাকিল না। সুরেন্দ্রনাথ সে আশা পূর্ণ করিলেন। স্বজনী শুনিতে পাইল, তাহা-দিগের চারিহস্ত একত্রিত হইয়াছে। স্বজনীর চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হইবার পরিবর্ত্তে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। স্বজনীর পাপপ্রাণ বহির্গত হইল।

উপসংহার।

সুরেন্দ্রনাথের সহিত হেমপ্রভার ও কুসুমকুমারীর সহিত নলিনী-কান্তের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অমরেন্দ্রবাবু সমুদায় সম্পত্তি কুসুমকুমারীকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। গৃহের যাবতীয় আসবাব, নগদ টাকা ও বাড়ী খানি হেমপ্রভাকে দান করিলেন। অমরেন্দ্র বাবু ও মনোরমা কাশী গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। হেমপ্রভা, কুসুমকুমারী, নলিনীকান্ত ও সুরেন্দ্রনাথ কত চেষ্টা করি-লেন, কিছুতেই তাঁহাদিগের চিত্তের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। কুসুমকুমারী হেমপ্রভাকে ভালবাসার পুরস্কার স্বরূপ পিতৃসম্পত্তি সমুদায় অর্পণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যাহাতে আপনাকে দুঃখী বলিয়া মনে না করেন, কুসুমের সেই অভিলাষ।

সম্পূর্ণ।